أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 99 - 4) www.motaher21.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ

"সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য ।"
" All the praises and thanks be to Allah."

সুরা: আল-ফাতিহা
আয়াত নং :-৪

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۝

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

৪ নং আয়াতের তাফসীর:

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা (نَعْبُدُ) ক্রিয়ার পূর্বে (إِيَّاكَ) কর্মপদকে নিয়ে এসেছেন সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি, অন্য কারো নয় এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই, অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে চাই না।

এটাই হল তাওহীদে উলুহিয়্যাহ

(توحيد الألوهية),

ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এককত্ব যা মুসলিমদের ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য করে।

অধিকাংশ মুসলিমদের বিশ্বাস, আমরা আল্লাহ তা'আলার ওপর বিশ্বাসী, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর বিশ্বাসী; তাই আমরা মুসলিম। আর যারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করে না তারা কাফির। এ ধারণা ভুল, কারণ মক্কার তৎকালীন মুশরিকগণ বিশ্বাস করত আল্লাহ তা'আলা আছেন, আল্লাহ তা'আলা একজন, তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক এবং তাদের ভাল-মন্দের মালিক ইত্যাদি। মূলত এটা হল তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ

(توحيد الربوبية)

তারা স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার এককত্বের ওপর বিশ্বাসী ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)

"আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'।" (সূরা যুমার ৩৯:৩৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন?'তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। (সূরা আনকাবুত ২৯:৬১)

অনুরূপভাবে সূরা লুকমানের ২৫ নং আয়াতে ও সূরা যুখরুফের ৯ নং আয়াতে মুশরিকদের তাওহীদে রুবুবিয়্যাহর স্বীকৃতির কথা উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হতো তাহলে তারা মূর্তির কাছে ধরনা দিত, তাদের কাছে সাহায্য চাইত অর্থাৎ সরাসরি তাওহীদে উলুহিয়্যাহ বিশ্বাস করত না। তাই একজন ব্যক্তি যতক্ষণ না তাওহীদে উলুহিয়্যাহর (ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এককত্বের) ওপর বিশ্বাস করতঃ আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মু'মিন হতে পারবে না। ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার এককত্ব মেনে নেয়া মাত্র ব্যক্তির চাওয়া পাওয়াসহ সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই হবে। আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান সবকিছু আল্লাহ তা'আলারই মেনে চলবে এবং দু'আ-প্রার্থনা, সিজদা, কুরবানী সবকিছু শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই করবে। এ তাওহীদ না থাকলে সে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর পূজা-উপাসনা করতে পারে, যেমন ছিল মক্কার মুশরিকদের অবস্থা। অনেকে ধারণা করে ইবাদত শুধু সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, কালেমা ইত্যাদি। এরূপ ধারণা সঠিক নয় বরং ইবাদত হলো: প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ঐ সকল কথা ও কাজ যা আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন বা যা দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

"বল আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র বিশ্বের প্রতিপালকের জন্য।" (সূরা আন'আম ৬:১৬২)

ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে নাবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)

"আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, (তারা বলবে) তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর।" (সূরা নাহল ১৬:৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ)

"আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই।" (সূরা হূদ ১১:৫০)

এরূপ সামূদ, সালেহ ও নূহসহ সকল নাবীদেরকে তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার এককত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন। আমাদের নাবী, সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাওয়াত ও শিক্ষাও ছিল সেরূপ। তিনি মক্কার মানুষদের যখন বললেন:

قُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا

‘বল, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মা‘বূদ নেই, তোমরা সফল হবে।’ (সহীহ ইবনু খুযাইমা হা: ১৫৯) এ দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথে নিকটের মানুষ দূর হয়ে গেল, বন্ধু শত্র“ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে এ আকীদাহ ও আদর্শের ওপর গড়ে তুলেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছোট বালক আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) কে বলেন:

يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

হে বৎস! আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দেব। তুমি আল্লাহ তা‘আলার বিধানকে হেফাযত কর আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে হেফাযত করবেন, তুমি আল্লাহ তা‘আলার বিধানকে হেফাযত কর (তাহলে) সর্বাবস্থায় তাঁকে পাবে। যখন কিছু চাবে তখন আল্লাহ তা‘আলার কাছেই চাবে, যখন সাহায্য চাবে তখন আল্লাহ তা‘আলার কাছেই সাহায্য চাবে। (তিরমিযী হা: ২৫১৬, মিশকাত হা: ৫৩০২, সহীহ)

ইবাদাত শব্দটিও আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (১) পূজা ও উপাসনা করা,
(২) আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলা এবং
(৩) বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার পূজা-উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার বন্দেগী ও দাসত্বও করি। আর আমরা তোমার সাথে এ সম্পর্কগুলো রাখি কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং এ সম্পর্কগুলো আমরা একমাত্র তোমারই সাথে রাখি। এই তিনটি অর্থের মধ্যে কোনো একটি অর্থেও অন্য কেউ আমাদের মাবুদ নয়।

অর্থাৎ তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল ইবাদাতের নয় বরং আমাদের সাহায্য প্রার্থনার সম্পর্কও একমাত্র তোমারই সাথে রয়েছে। আমরা জানি তুমিই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের রব। সমস্ত শক্তি তোমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তুমি একাই যাবতীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের অধিকারী। তাই আমাদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা একমাত্র তোমারই দুয়ারে ধর্ণা দেই। তোমারই সামনে নিজেদের সুপর্দ করে দেই এবং তোমারই সাহায্যের ওপর নির্ভর করি। এ জন্য আমাদের এই আবেদন নিয়ে আমরা তোমার দুয়ারে হাজির হয়েছি।

ইবাদতের অর্থ হল, কারো সন্তুষ্টি লাভের জন্য অত্যধিক কাকুতি-মিনতি এবং পূর্ণ নম্রতা প্রকাশ করা। আর ইবনে কাসীর (রঃ) এর উক্তি অনুযায়ী 'শরীয়তে পূর্ণ ভালবাসা, বিনয় এবং ভয়-ভীতির সমষ্টির নাম হল ইবাদত।' অর্থাৎ, যে সত্তার সাথে ভালবাসা থাকবে তাঁর অতিপ্রাকৃত মহাক্ষমতার কাছে অসামর্থ্য ও অক্ষমতার প্রকাশও হবে এবং প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা তাঁর পাকড়াও ও শাস্তির ভয়ও থাকবে। এই আয়াতে সরল বাক্য হল, [نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ] (আমরা তোমার ইবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য চাই।) কিন্তু মহান আল্লাহ এখানে مفعول (কর্মপদকে) فعل (ক্রিয়াপদ)-এর আগে এনে [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ] বলেছেন। আর এর উদ্দেশ্য বিশেষত্ব সৃষ্টি করা। (যেহেতু আরবী ব্যকরণে যে পদ সাধারণতঃ পরে ব্যবহার হয় তা পূর্বে প্রয়োগ করা হলে বিশেষত্বের অর্থ দিয়ে থাকে।) সুতরাং এর অর্থ হবে, 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।' এখানে স্পষ্ট যে, ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয নয়, যেমন সাহায্য কামনা করাও তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে বৈধ নয়। এই বাক্য দ্বারা শির্কের পথ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যাদের অন্তরে শির্কের ব্যাধি সংক্রমণ করেছে, তারা লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা ও অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্যকে দৃষ্টিচ্যুত ক'রে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। তারা বলে, দেখুন! যখন আমরা অসুস্থ হই, তখন সুস্থতার জন্য ডাক্তারের নিকট সাহায্য চাই। অনুরূপ বহু কাজে স্ত্রী, চাকর, ড্রাইভার এবং অন্যান্য মানুষের কাছেও সাহায্য কামনা করি। এইভাবে তারা বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছেও সাহায্য কামনা করা জায়েয। অথচ প্রাকৃত বা লৌকিক সাহায্য একে অপরের নিকট চাওয়া ও করা সবই বৈধ; এটা শির্ক নয়। এটা তো মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এমন এক নিয়ম-নীতি, যাতে সমস্ত লৌকিক কার্য-কলাপ বাহ্যিক হেতুর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এমন কি নবীরাও (সাধারণ) মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, [مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ] অর্থাৎ, কারা আছে যারা আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? (সূরা আলে ইমরান

৩:৫২ আয়াত) আর আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিনদেরকে বলেন, [وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى] অর্থাৎ, তোমরা নেকী এবং আল্লাহভীতির কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। (সূরা মাইদাহ ৫:২ আয়াত) বুঝা গেল যে, এ রকম সাহায্য (চাওয়া ও করা) নিষেধও নয় এবং শির্কও নয়। বরং তা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংনীয় কাজ। পারিভাষিক শির্কের সাথে এর কি সম্পর্ক? শির্ক তো এই যে, এমন মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করা যে বাহ্যিক হেতুর ভিত্তিতে কোন সাহায্য করতে পারবে না। যেমন, কোন মৃত ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করা, তাকে বিপদ থেকে মুক্তিদাতা এবং প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা, তাকে ভাল-মন্দের মালিক ভাবা এবং বিশ্বাস করা যে, সে দূর এবং নিকট থেকে সকলের ফরিয়াদ শোনার ক্ষমতা রাখে। এর নাম হল, অলৌকিক পন্থায় সাহায্য চাওয়া এবং তাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা। আর এরই নাম হল সেই শির্ক, যা দুর্ভাগ্যক্রমে অলী-আওলিয়াদের মহববতের নামে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। أعاذنا الله منه

তাওহীদ তিন প্রকারের। এখানে মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রকারের কথা উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে হয়। এই প্রকারগুলো হলঃ তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ), তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (উপাস্যত্বের একত্ববাদ) এবং তাওহীদুল আসমা অসসিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ)।

১। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর অর্থ হল, এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মালিক, রুযীদাতা, নিয়ন্তা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। নাস্তিক ও জড়বাদীরা ব্যতীত সকল মানুষই এই তাওহীদকে স্বীকার করে। এমনকি মুশরিক (অংশীবাদী)রাও এটা বিশ্বাস করতো এবং আজও করে। যেমন ক্বুরআন কারীমে মুশরিকদের এ তাওহীদকে স্বীকার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং কেই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তারা বলবে, আল্লাহ।" (অর্থাৎ, সমস্ত কর্ম সম্পাদনকারী হলেন আল্লাহ।) (সূরা ইউনুস ১০:৩১) অন্যত্র বলেছেন, "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সূরা যুমার ৩৯:৩৮) তিনি আরো বলেছেন, "জিজ্ঞেস কর, এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জানো ? তারা ত্বরিৎ বলবে, আল্লাহর; বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি ? তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না । জিজ্ঞেস কর, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে; যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জানো ? তারা বলবে, আল্লাহর। (সূরা মু'মিনুন ২৩:৮৪-৮৯) এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত আছে।

২। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর অর্থ হল, সর্ব প্রকার ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহকে মনে করা। আর ইবাদত সেই সব কাজকে বলা হয়, যা কোন নির্দিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি লাভের আশায় অথবা তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়ে করা হয়। (অন্য কথায়ঃ ইবাদত প্রত্যেক সেই গুপ্ত বা প্রকাশ্য কথা বা কাজের নাম, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।) সুতরাং কেবল নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জই ইবাদত নয়, বরং কোন সত্তার নিকট দুআ ও আবেদন করা তার নামে মানত করা, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা, তার তাওয়াফ করা এবং তার কাছে আশা রাখা ও তাকে ভয় করা ইত্যাদিও ইবাদত। তাওহীদে উলূহিয়্যাহ হল (উল্লিখিত) সমস্ত কাজ কেবল মহান আল্লাহর জন্য সম্পাদিত হওয়া। কবরপূজার ব্যাধিতে আক্রান্ত আম-খাস বহু মানুষ তাওহীদে উলূহিয়্যাতে শির্ক করছে। উল্লিখিত ইবাদতসমূহের অনেক প্রকারই তারা কবরে সমাধিস্থ ব্যক্তিদের এবং মৃত বুযুর্গদের জন্য ক'রে থাকে যা সুস্পষ্ট শির্ক।

৩। তাওহীদুল আসমা অসসিফাত হল, মহান আল্লাহর যে গুণাবলী ক্বুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিকে কোন রকমের অপব্যাখ্যা এবং বিকৃত করা ছাড়াই বিশ্বাস করা। আর এই গুণাবলীর অনুরূপ অধিকারী (আল্লাহ ছাড়া) অন্য কাউকে মনে না করা। যেমন, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান (গায়বী খবর) রাখা তাঁর গুণ, দূর ও নিকট থেকে সকলের ফরিয়াদ শোনার শক্তি তিনি রাখেন, বিশ্বজাহানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার সব রকমের এখতিয়ার তাঁরই; এই ধরনের আরো যত ইলাহী গুণাবলী আছে আল্লাহ ব্যতীত কোন নবী, ওলী এবং অন্য কাউকেও এই গুণের অধিকারী মনে না করা। করলে তা শির্ক হয়ে যাবে। বড় দুঃখের বিষয় যে, কবরপূজারীদের মধ্যে এই প্রকারের শির্ক ব্যাপক। তারা আল্লাহর উল্লিখিত গুণে অনেক বুযুর্গদেরকে অংশীদার বানিয়ে রেখেছে। أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ

ক্বিরা'আত প্রসঙ্গ 'ইবাদত শব্দের ধর্মীয় তত্ব ও তাৎপর্য

''ইবাদত' শব্দের আভির্ধানিক অর্থ হচ্ছে সার্বিক অপমান ও নীচতা। যেমন 'তারীকে মোয়াব্দ' সাধারণ ঐ পথকে বলে যা সবচেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ রকমই بَعِيْرٌ مُعَبَّدٌ ঐ উটকে বলা হয় যা হীনতা ও দুর্বলতার চরম সীমায় পদার্পণ করে। শারী'আতের পরিভাষায় প্রেম, বিনয়, নম্রতা এবং ভীতির সমষ্টির নাম ''ইবাদত।'

কিছু করার পূর্বে মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করার উপকারিতা

পঞ্চম আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ 'আমরা আপনার ব্যতীত আর কারো 'ইবাদত করি না এবং আপনার ব্যতীত আর কারো ওপর নির্ভর করি না।' এখানে اِيَّاكَ শব্দটি মাফউল, একে পূর্বে আনা হয়েছে। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যাতে তার গুরুত্ব বেড়ে যায়। আর সাহায্য প্রার্থনার জন্যে যেন একমাত্র আল্লাহই বিশিষ্ট হয়ে যান। আর এটা হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস। সালফি সালিহীন বা পূর্বযুগীয় প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞজনদের কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন যে, সম্পূর্ণ কুর'আনের গোপন তথ্য রয়েছে সূরাহ্ ফাতিহার মধ্যে এবং এ পূর্ণ সূরাহ টির গোপন তথ্য اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) এ আয়াতটিতে রয়েছেঃ

আয়াতটির প্রথমাংশে রয়েছে শির্কের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং দ্বিতীয়াংশে রয়েছে স্বীয় ক্ষমতার ওপর অনাস্থা ও মহাশক্তিশালী মহান আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কীয় আরো বহু আয়াত পবিত্র কুর'আনে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি বলেনঃ

(فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ)

সুতরাং তাঁর 'ইবাদত করো এবং তাঁর ওপর নির্ভর করো, আর তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন। (১১ নং সূরাহ্ হুদ, আয়াত নং ১২৩) তিনি আরো বলেনঃ

(قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا)

বলোঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই ওপর নির্ভর করি। (৬৭ নং সূরাহ্ মূল্ক, আয়াত নং ২৯)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا)

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ করো। (৭৩ নং সূরাহ্ মুয্যাম্মিল, আয়াত নং ৯)

(اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) এ আয়াতেও এই বিষয়টিই রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো সম্মখুস্থ কাউকে লক্ষ্য করে সম্বোধন ছিলো না। কিন্তু এ আয়াতটিতে মহান আল্লাহকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এতে বেশ সুন্দর পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে। কেননা বান্দা যখন মহান আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করলো তখন সে যেন মহাপ্রতাপশালী মহান আল্লাহর সম্মুখে হাযির হয়ে গেলো। এখন সে মালিককে সম্বোধন করে স্বীয় দীনতা, হীনতা ও দারিদ্রতা প্রকাশ করলো এবং বলতে লাগলোঃ 'হে মহান আল্লাহ! আমারা তো আপনার হীন ও দুর্বল দাস মাত্র এবং আমরা সব কাজে, সর্বাবস্থায় ও সাধনায় একমাত্র আপনারই মুখাপেক্ষী। এ আয়াতে এ কথারও প্রমাণ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী সমস্ত বাক্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ খবর দেয়া হয়েছিলো।

সূরাহ্ ফাতিহা মহান আল্লাহর প্রশংসা শিক্ষা দেয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উত্তম গুণাবলীর জন্য নিজের প্রশংসা নিজেই করেছিলেন এবং বান্দাদেরকে ঐ শব্দগুলো দিয়েই তাঁর প্রশংসা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্যই যে ব্যক্তি এ সূরাহ টি জানা সত্বেও সালাতে তা পাঠ করে না তার সালাত

হয় না। যেমন সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে ‘উবাদাহ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

‘ঐ ব্যক্তির সালাতকে সালাত বলা যায় না যে সালাতের মধ্যে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করে না।’ (সহীহুল বুখারী-৭৫৬, সহীহ মুসলিম ১/২৯৫।

আমাদের দেশে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ভাইয়েরা ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করেন না, এটা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ‘আমলের পরিপন্থী। ইমামের পিছনে মুক্তাদিকে অবশ্যই সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করতে হবে। মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা না পড়লে তার সালাত, সালাত বলে গণ্য হবে না। যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله (রাঃ) تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم إنا لنهذ هذا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن.

সহীহুল বুখারীর অন্য বর্ণনায় জুয’উল কিরা’আতের মধ্যে আছে ‘আম্র বিন শু‘আইব তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন তোমরা কি আমার পিছনে কিছু পড়ে থাকো? তাঁরা বললেন যে, হ্যাঁ আমরা খুব তাড়াহুড়া করে পাঠ করে থাকি। তারপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন তোমরা উম্মুল কুর’আন অর্থাৎ সূরাহ্ ফাতিহা ব্যতীত কিছুই পড়ো না।

[সহীহুল বুখারী হাঃ ১ম ১০৪ পৃষ্ঠা। জুযউল ক্বিরা’আত। সহীহ মুসলিম ১৬৯, ১৭০ পৃষ্ঠা। সুনান আবূ দাঊদ ১০১ পৃষ্ঠা। জামি‘ তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৭,৭১ পৃষ্ঠা। সুনান নাসাঈ ১৪৬ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৬১ পৃষ্ঠা। মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ ৯৫ পৃষ্ঠা। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ১০৬ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা। সহীহ মুসলিম ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হাদীস নং ৭৫৮-৭৬৭ ও ৮২০-৮২৪। হাদীস শরীফ, মাওঃ ‘আবদুর রহীম, ২য় খণ্ড ১৯৩-১৯৬ পৃষ্ঠা, ইসলামিয়াত বি-এ. হাদীস পর্ব-১৪৪-১৬১ পৃষ্ঠা। হিদায়াহ দিরায়াহ ১০৬ পৃষ্ঠা। মিশকাতুল মাসাবীহ ৭৮ পৃষ্ঠা। সহীহুল বুখারী হাঃ শায়খ ‘আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৪১। সহীহুল বুখারী হাঃ- আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭১২। সহীহুল বুখারী হাঃ- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭১৮। জামি‘ তিরমিযী- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১ম খণ্ড হাদীস নং ২৪৭। মিশকাতুল মাসাবীহ- নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদ্রাসা পাঠ্য হাদীস নং ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৯৪। বুলূগুল মারাম ৮৩ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সা‘আদাত ১ম খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা।] সহীহ মুসলিম ৪/১১, হাঃ ৩৯৪, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ২২৮০৭; আ.প্র. হাঃ ৭১২, ই.ফা. হাঃ ৭২০। (অনুবাদক)) সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেনঃ ‘আমি সালাতকে আমার মধ্যে ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছি। অর্ধেক অংশ আমার ও বাকী অর্ধেক অংশ আমার বান্দার। বান্দা যা চাবে তাকে তাই দেয়া হবে।

অতএব বান্দা যখন (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ)বলে, তখন মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো।’ বান্দা যখন বলে (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)তখন তিনি বলেনঃ ‘আমার বান্দা আমার গুণগান করলো।’ যখন সে বলে (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ)তখন তিনি বলেনঃ ‘আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলো।’ সে যখন বলে (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার কথা এবং আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চাবে।’ তারপর বান্দা যখন (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ)পাঠ করে তখন মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘এ সবই তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাবে তার জন্য তাই রয়েছে।’ (সহীহ মুসলিম ১/২৯৭)

তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর অর্থ হচ্ছেঃ ‘হে আমার রাব্ব! আমরা বিশেষভাবে একাত্মবাদে বিশ্বাসী, আমরা ভয় করি এবং মহান সত্ত্বায় সকল সময়ে আশা রাখি। আপনি ছাড়া আর কারো আমরা ‘ইবাদতও করি

না, কাউকে ভয়ও করি না এবং কারো ওপর আশাও রাখি না।' আর وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর তাৎপর্য ও ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্য বরণ করি ও আমাদের সকল কাজে একমাত্র আপনারই কাছে সহায়তা প্রার্থনা করি।

তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ

কাতাদাহ (রহঃ) বলেনঃ 'এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করো এবং তোমাদের সকল কাজে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো।' اِيَّاكَ نَعْبُدُ-কে পূর্বে আনার কারণ এই যে, 'ইবাদতই হচ্ছে মূল ঈপ্সিত বিষয়, আর সাহায্য চাওয়া 'ইবাদতেরই মাধ্যম ও ব্যবস্থা। আর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পূর্বে বর্ণনা করা এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পরে বর্ণনা করা। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান

প্রশ্নঃ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এখানে বহুবচন অর্থাৎ আমরা ব্যবহার রহস্য কি? যদি এটা বহুবচনের জন্য হয় তবে উক্তি কারীতো একজনই। আর যদি সম্মান ও মর্যাদার জন্য হয় তাহলে এ স্থানের জন্য তা উপযুক্ত নয়।

উত্তরঃ উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, একজন বান্দা যেন সমস্ত বান্দার পক্ষ থেকে সংবাদ দিচ্ছে, বিশেষ করে যখন সে জামা'আতের সাথে সালাতে দাঁড়ায় এবং ইমাম নির্বাচিত হয়। তখন সে নিজের ও তার মু'মিন ভাইদের পক্ষ থেকে এমন 'ইবাদতের স্বীকৃতি বা সংবাদ দিচ্ছে, যে 'ইবাদতের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর সে তাদের পক্ষ থেকে কল্যাণের নিমিত্তে আগে বেড়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন এটা সম্মানের জন্য। যেন তার 'ইবাদতে মগ্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে তাকেই বলা হচ্ছে 'তুমি ভদ্র, তোমার সম্মান আমার দরবারে খুবই বেশি। সুতরাং তুমি বলো, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ' আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" এ কথা বলে নিজেকে সম্মানের সাথে স্বরণ করো। কিন্তু যখন তুমি 'ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে তখন 'আমরা' এবং 'আমরা করি না' এ জাতিয় শব্দ ব্যবহার করবে না। যদিও তুমি হাজার হাজার বা লাখ লাখ লোকের মাঝে অবস্থান করো। কেননা সবাই মহান আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী।

কারো কারো মতে اِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে যতোটা বিনয় ও নম্রতার ভাব ফুটে উঠে তা إياك عبدنا এর মধ্যে ফুটে উঠে না। কেননা এর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও 'ইবাদতের উপযুক্ততা পাওয়া যায়। অথচ মহান আল্লাহর পূর্ণ ও যথার্থ 'ইবাদত করতে কোন বান্দা কোন ক্রমেই সক্ষম নয়। যেমন কোন একজন কবির উক্তিঃ لَا تَدْعُنِيْ إِلَّا بِيَا عَبْدَهَا ... فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي

অর্থাৎ আমাকে তার দাস বলেই ডাকো, কেননা এটাই আমার সর্বোত্তম নাম।

মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন 'দাস'

যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় দানের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই শুধু তিনি তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম عَبْد বা দাস নিয়েছেন। বড় বড় নি'য়ামত যেমন কুর'আন মাজীদ অবতীর্ণ করা, সালাতে দাঁড়ানো, মি'রাজ করানো ইত্যাদি। যেমন তিনি বলেনঃ

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ)

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। (১৮ নং সূরাহ্ কাহফ, আয়াত নং ১)

তিনি আরো বলেনঃ (وَّ اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ)

আর এই যে, যখন মহান আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো। (৭২ নং সূরাহ্ জ্বিন, আয়াত নং ১৯)

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ (سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا)

পবিত্র ও মহিমায় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ১)

বিপদাপদে মহান আল্লাহর কাছে সিজদাবনত হতে হবে

মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আন মাজীদে এ শিক্ষা দিয়েছেনঃ 'হে নবী! বিরুদ্ধবাদীদের অবিশ্বাসের ফলে যখন তোমার মন সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে তখন তুমি আমার 'ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যাও।' তাই নির্দেশ হচ্ছেঃ

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ یَضِیْقُ صَدْرُكَ بِمَا یَقُوْلُوْنَ ۙ﴿۹۷﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِّنَ السّٰجِدِیْنَ ۙ﴿۹۸﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰی یَاْتِیَكَ الْیَقِیْنُ)

আমি তো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের 'ইবাদত করো। (১৫ নং সূরাহ্ হিজর, আয়াত নং ৯৭-৯৯)

ইমাম রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে কোন কোন লোক হতে বর্ণনা করেছেন যে, রিসালাত অপেক্ষা 'উবূদীয়াতের মর্যাদা বেশি। কেননা 'ইবাদতের সম্পর্ক সৃষ্ট বান্দা হতে সৃষ্টিকর্তার দিকে হয়ে থাকে। আর রিসালাতের সম্পর্ক হয় সৃষ্টিকর্তা থেকে সৃষ্টির দিকে। তাছাড়া মহান আল্লাহ বান্দার সমস্ত কল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব নেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতের সৎ কার্যাবলীর অভিভাবক হয়ে থাকেন। (তাফসীরে কাবীর ১/২০২। হাদীস য'ঈফ, যেমনটি মুসান্নিফ ইবনু কাসীর বলেছেন) তবে এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল এবং এ দুটোর দালীলই য'ঈফ ও ভিত্তিহীন। বড়ই বিস্ময়কর বিষয় হলো, ইমাম রাযী (রহঃ) এটাকে য'ঈফও বললেন আবার এর প্রতিবাদ করলেন না।

কোন কোন সূফী বলেন যে, 'ইবাদত করা হয় দু'টি কারণের কোন একটি কারণে। আর তা হলো হয়তো পুণ্য লাভ করা হবে অথবা শাস্তি প্রতিরোধ করা হবে। এটাও তাদের মতে য'ঈফ। বরং 'ইবাদতের সবচেয়ে উত্তম পন্থা এই যে, মানুষ সেই মহান সত্তার 'ইবাদত করবে, যিনি সমুদয় গুণে গুণান্বিত। 'ইবাদত করবে শুধু তার সত্তার জন্য এ ব্যতীত আর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না। এজন্যই সালাত সম্পাদনকারী ব্যক্তি সালাতে বলে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত পড়ছি। যদি তা পুণ্যলাভ ও শাস্তি হতে বাঁচার জন্য হয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে অন্য দল এটা প্রতিবাদ করে বলেন যে, যে কোন 'ইবাদত মহান আল্লাহর জন্য হওয়াটা প্রতিকুল নয়, যদিও তার বিনিময়ে সাওয়াব কামনা করা এবং শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে করা হয়। যেমন একজন বেদুঈন লোক মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আবেদন করলেন যে, হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)!

حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ (রাঃ) لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ.

'আমি আপনার মতো ও মু'আয (রাঃ)-এর মতো পড়তে জানি না। আমি তো শুধু মহান আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমরাও তারই কাছাকাছি পড়তে থাকি।' (আবূ দাউদ, ৭৫৭, ১/৭৯২, ইবনু মাজাহ, ১/৯১০, মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৭৪, ৫/৭৪। হাদীসটি সহীহ)

সুরা: আল-ফাতিহা
আয়াত নং :- ৫

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও,

৫ নং আয়াতের তাফসীর:

'আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।'অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করত আপনার সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত তার ওপর বহাল থাকার তাওফীক দান করুন। (তাফসীর মুয়াসসার, অত্র আয়াতের তাফসীর)

হিদায়াত (هِدَايَةٌ) দুই প্রকার:

١. هِدَايَةُ الْإِرْشَادِ وَالدَّلَالَةِ

(হিদায়াতুল ইরশাদ ওয়াদ দালালাহ): পথ প্রদর্শন ও নির্দেশনামূলক হিদায়াত। নাবী-রাসূলসহ সকল মানুষ এ প্রকার হিদায়াত বা পথপ্রদর্শন করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلٰي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

"তুমি অবশ্যই সরল পথের পথ প্রদর্শন করবে।"(সূরা শুরা ৪২:৫২) অর্থাৎ সরল পথের পথ নির্দেশনা দিবে।

٢. هِدَايَةُ التَّوْفِيْقِ

(হিদায়াতুত্ তাওফীক): সরল সঠিক পথ গ্রহণ ও তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দান করা। এ প্রকার হিদায়াত শুধু আল্লাহ তা'আলার হাতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ)

"তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে হিদায়াত দিতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে হিদায়াত দেন। (সূরা কাসাস ২৮:৫৬)

সিরাতুল মুস্তাকীম

(اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ)

সম্পর্কে ইমাম সাওরী (রহঃ) বলেন: সিরাতুল মুস্তাকীম হল আল্লাহ তা'আলার কিতাব। কেউ বলেছেন: ইসলাম, বিশিষ্ট তাবিঈ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন: সিরাতুল মুস্তাকীম দ্বারা উদ্দেশ্য হল اَلْحَقُّ বা সত্য। তাবিঈ মুজাহিদের মতটিই অন্যান্য মুফাসসিরদের মতামতকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পূর্বের মতামতের সাথেও এর কোন বিরোধ নেই। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত-

(اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ)

(সিরাতুল মুস্তাকীম) হল اَلْإِسْلَامُ (ইসলাম)। (তাফসীর মুয়াসসার পৃঃ ১) সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ওয়াহী তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পূর্ণভাবে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নামই হল সিরাতুল মুস্তাকীমে থাকা।

সিরাতুল মুস্তাকীমের বর্ণনা দিতে একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে একটি লম্বা রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা হল আল্লাহ তা‘আলার সরল পথ। আরো কিছু রেখা তাঁর ডান ও বাম পাশে টানলেন এবং বললেন, এগুলো হল এমন পথ যার ওপর শয়তান বসে আছে এবং সে এ পথগুলোর দিকে মানুষকে আহ্বান করে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলায়ওয়াত করলেন

(وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا)

‘আর নিশ্চয়ই এ পথই আমার সহজ-সরল পথ’- আয়াত । (মুসনাদ আহমাদ হা: ৪১৪২, সহীহ) এ সিরাতে মুস্তাকীম হল, মুসলিম উম্মাহর মূল ভিত্তি। এ সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়ার কারণে উম্মত বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত। অতএব সেই সরল পথে ফিরে আসতে হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ মত সকল পথ, মত ও তরীকা বর্জন করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে ইসলাম মেনে চলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতদিন তা আকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু’টি বিষয় হল, আল্লাহ তা‘আলার কিতাব কুরআন ও তাঁর নাবীর সুন্নাত (হাদীস)। (মুয়াত্তা মালিক হা: ৩৩৩৮, হাকীস, সহীহ হা: ২৯১)

(صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ...)

-যাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা অনুগ্রহ করেছেন তাদের বর্ণনা এ আয়াতে না থাকলেও সূরা নিসার ৬৯ নং আয়াতে এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا)

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে সে নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ কর্মশীল- যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!” (সূরা নিসা ৪:৬৯) অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তরা চার শ্রেণির: নাবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহ বা সৎ কর্মশীলগণ।

(غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ)

‘তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট’আদি বিন হাতেম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: গযবপ্রাপ্ত (الْمَغْضُوْبِ) হল ইয়াহূদীগণ, আর পথভ্রষ্ট (الضَّآلِّيْنَ) হল খ্রিস্টানগণ। (তিরমিযী হা: ২৯৫৪, সহীহ, ইবনে হিব্বান ৮/৪৮)

এরূপ আরো অনেক মত রয়েছে। যাতে ইয়াহূদীদেরকে গযবপ্রাপ্ত ও খ্রিস্টানদেরকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। (তাফসীরে তাবারী ১/১৪৬) ইয়াহূদীগণ গযবপ্রাপ্ত, কারণ তারা জানত কিন্তু মানত না, আর খ্রিস্টানগণ পথভ্রষ্ট কারণ তারা না জেনেশুনেই আমল করত। (আযওয়াউল বায়ান ১/৬০)

ইয়াহূদীদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

(فَبَآءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ)

"অতঃপর তারা গযবের পর গযবে পতিত হয়েছে।"(সূরা বাকারাহ ২:৯০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ)

"আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহর নিকট আছে? যাকে আল্লাহ লা'নত করেছেন এবং যার ওপর তিনি গযব দিয়েছেন (এরা প্রতিদানের দিক দিয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট)।"(সূরা মায়িদাহ ৫:৬০)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)

"নিশ্চয়ই যারা গো-বৎসকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনে তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের গযব ও লাঞ্ছনা পতিত হবেই।"(সূরা আরাফ ৭:১৫২)

আর পথভ্রষ্ট খ্রিস্টানদের ব্যাপারে মু'মিনদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ)

"তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি কর না এবং যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে ও সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না।"(সূরা মায়িদাহ ৫:৭৭)

অতএব আমরা প্রত্যহ সালাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে নাবী রাসূলদের পথে চলার এবং ইয়াহূদ খ্রিস্টানদের পথে না চলার বিনীত আবেদন করি, কিন্তু বাস্তব জীবনে যদি সচেতন না হই তাহলে এ আবেদন ফলপ্রসূ হবে না। সুতরাং বাস্তবে সেভাবে চলা প্রতিটি মু'মিনের একান্ত কর্তব্য এবং মনে রাখতে হবে যে, খ্রিস্টানদের স্বভাব হল না জেনে অন্ধ ও অজ্ঞের মত ইবাদত করা। আর ইয়াহূদীদের স্বভাব হল জানার পরও সে অনুযায়ী আমল না করা। সুতরাং খাঁটি মুসলিমের পথ হল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জেনে-শুনে ইবাদত করা এবং কুরআন ও সহীহ হাদীস জানতে পারলে মাযহাব, তরীকা ও দাপ-দাদার দোহাই না দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে সে অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন।

অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে, চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি-ব্যবস্থা আমাদের শেখাও, যা হবে একেবারেই নির্ভুল, যেখানে ভুল দেখা, ভুল কাজ করাও অশুভ পরিণামের আশঙ্কা নেই, যে পথে চলে আমরা সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। কুরআন অধ্যয়নের প্রাক্কালে বান্দা তার প্রভু, মালিক, আল্লাহর কাছে এই আবেদনটি পেশ করে। বান্দা আর্জি পেশ করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও। কল্পিত দর্শনের গোলকধাঁধার মধ্য থেকে যথার্থ সত্যকে উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর। বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা-দর্শনের মধ্য থেকে যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা-দর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপিত কর। জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের, সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও।

স্নেহ ও করুণা এবং কল্যাণ কামনাসহ কাউকে মঙ্গলময় পথ দেখিয়ে দেয়া ও মনজিলে পৌঁছিয়ে দেয়াকে আরবী পরিভাষায় 'হেদায়াত' বলে। 'হেদায়াত' শব্দটির দুইটি অর্থ। একটি পথ প্রদর্শন করা, আর দ্বিতীয়টি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। যেখানে এই শব্দের পর দুইটি object থাকবে (الى) থাকবে না, সেখানে এর অর্থ হবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। আর যেখানে এ শব্দের পর (الى) শব্দ আসবে, সেখানে অর্থ হবে পথ-প্রদর্শন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

(اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ)

"নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্যস্থলে—মনজিলে পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন না যাকে আপনি পৌঁছাতে চাইবেন। বরং আল্লাহ্ই লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন " [সূরা আল-কাসাস: ৫৬] এ আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর (الى) ব্যবহৃত হয়নি বলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া অর্থ হয়েছে এবং তা করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধ্যায়ত্ত নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে পথ প্রদর্শন রাসূলে কারীমের সাধ্যায়ত্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

(وَاِنَّكَ لَـتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ)

"হে নবী! আর আপনি অবশ্যই সরল সঠিক দৃঢ় ঋজু পথ প্রদর্শন করেন "[সূরা আশ-শূরা:৫২]
কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। তাই তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন,

(وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا)

"আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল সোজা সুদৃঢ় পথে পৌঁছিয়ে দিতাম। " [সূরা আন-নিসা ৬৮]

সূরা আল-ফাতিহা'র আলোচ্য আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর (الى) শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ফলে এর অর্থ হবে সোজা সুদৃঢ় পথে মনজিলের দিকে চালনা করা। অর্থাৎ যেখানে বান্দাহ্ আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে শুধু এতটুকু বলে না যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে সোজা সুদৃঢ় পথের সন্ধান দিন। বরং বলে, 'হে আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে চলবার তাওফীক দিয়ে মনজিলে পৌছিয়ে দিন। কেননা শুধু পথের সন্ধান পাইলেই যে সে পথ পাওয়া ও তাতে চলে মনজিলে পৌঁছা সম্ভবপর হবে তা নিশ্চিত নয়।

কিন্তু 'সিরাতে মুস্তাকীম' কি? সিরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে, রাস্তা বা পথ। আর মুস্তাকীম হচ্ছে, সরল সোজা। সে হিসেবে সিরাতে মুসতাকীম হচ্ছে, এমন পথ, যা একেবারে সোজা ও ঋজু, প্রশস্ত ও সুগম; যা পথিককে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেয়; যে পথ দিয়ে লক্ষ্যস্থল অতি নিকটবর্তী এবং মনযিলে মাকছুদে পৌঁছার জন্য যা একমাত্র পথ, যে পথ ছাড়া লক্ষ্যে পৌছার অন্য কোন পথই হতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমারও রব তোমাদেরও রব, অতএব একমাত্র তারই দাস হয়ে থাক। এটাই হচ্ছে সিরাতুম মুস্তাকীম-সঠিক ও সুদৃঢ় ঋজু পথ " [সূরা মারইয়াম: ৩৬] অর্থাৎ আল্লাহ্কে রব স্বীকার করে ও কেবল তাঁরই বান্দাহ্ হয়ে জীবন যাপন করলেই সিরাতুম মুস্তাকীম অনুসরণ করা হবে। অন্যত্র ইসলামের জরুরী বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর এটাই আমার সঠিক দৃঢ় পথ, অতএব তোমরা এই পথ অনুসরণ করে চল। এছাড়া আরও যত পথ আছে, তাহার একটিতেও পা দিও না; কেননা তা করলে সে পথগুলো তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে-ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা ধ্বংসের পথ হতে আত্মরক্ষা করতে পার " [সূরা আল-আন আমঃ ১৫৩]

একমাত্র আল্লাহ্র নিকট থেকে যে পথ ও বিধি-বিধান পাওয়া যাবে, তাই মানুষের জন্য সঠিক পথ। আল্লাহ্ বলেন, "প্রকৃত সত্য-সঠিক-ঋজু-সরল পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর, যদিও আরও অনেক বাঁকা পথও রয়েছে। আর আল্লাহ্ চাইলে তিনি সব মানুষকেই হেদায়াতের পথে পরিচালিত করতেন। " [সূরা আন-নাহল:৯]

সিরাতে মুস্তাকীমের তাফসীর কোন কোন মুফাসসির করেছেন, ইসলাম। আবার কারও কারও মতে, কুরআন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] বস্তুত: আল্লাহ্র প্রদত্ত বিশ্বজনীন দ্বীনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত রূপ সিরাতুল মুস্তাকীম' শব্দ হতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব কবুল করে তারই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করার পথই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীম' এবং একমাত্র এই পথে চলার ফলেই মানুষ আল্লাহ্র নিয়ামত ও সন্তোষ লাভ করতে পারে। সে একমাত্র পথই মানব জীবনের প্রকৃত ও চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই সে একমাত্র পথে চলার তওফীক প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এই আয়াতটিতে।
কিন্তু আল্লাহ্র নিকট হতে এই পথ কিরূপে পাওয়া যেতে পারে? সে পথ ও পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে আল্লাহ্ এর তিনটি সুস্পষ্ট পরিচয় উল্লেখ করেছেন:

১. এই জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে তা তাদের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে, যারা উক্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে আল্লাহ্‌র নিকট হতে নিয়ামত ও অসীম অনুগ্রহ লাভ করেছে।

২. এই পথের পথিকদের উপর আল্লাহ্‌র গজব নাযিল হয় নি, অভিশপ্তও তারা নয়।

৩. তারা পথভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্টও নয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ কথা কয়টির বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

প্রশংসামূলক বাক্য আগে উল্লেখ করার কারণ

জামহূরগণ صراط শব্দটি 'সোয়াদ' দিয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ 'সিন' দিয়ে পড়েছেন, আবার কেউ কেউ 'যা' দিয়েও পড়েছেন। নাহুবিদ ফাররা (রহঃ) বলেন, এটা বানী উজরাহ ও বানী কালবের ক্বিরা'আত।

যেহেতু বান্দা প্রথমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছে, সেহেতু এখন তার কর্তব্য হবে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। যেমন পূর্বেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ বলেনঃ 'অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা চাবে তা সে পাবে।'

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)-এর মধ্যে কি পরিমাণ সূক্ষতা ও প্রকৃষ্টতা রয়েছে। প্রথমে বিশ্বপ্রভুর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান, তারপর নিজের ও মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আকুল প্রার্থনা। প্রার্থিত বস্তু লাভের এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা। এ উত্তম পন্থা নিজে পছন্দ করেই মহান আল্লাহ এ পন্থা স্বীয় বান্দাদের বলে দিলেন। কখনো কখনো প্রার্থনার সময় প্রার্থী স্বীয় অবস্থা ও প্রয়োজন প্রকাশ করে থাকে। যেমন মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ
(رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ)

হে আমার রাব্ব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল। (২৮ নং সূরাহ্‌ কাসাস, আয়াত নং ২৪)

ইউনুস (আঃ) দু'আ করার সময় বলেছিলেনঃ (لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ)

আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী। (২১ নং সূরাহ্‌ আম্বিয়া, আয়াত নং ৮৭) কোন কোন প্রার্থনায় প্রার্থী শুধুমাত্র প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেই নীরব থাকে। যেমন কবির উক্তিঃ

أَذْكُرُ حَاجَتِيْ أَمْ قَدْ كَفَانِيْ ... حَيَاؤُكَ إِنَّ شِيْمَتَكَ الْحَيَاءُ
إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْمًا ... كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ

অর্থাৎ আমার প্রয়োজনের বর্ণনা দেয়ার তেমন কোন দরকার নেই, তোমার দয়াপূর্ণ দানই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি জানি যে, দান ও সুবিচার তোমার পবিত্র ও চিরাচরিত অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে দেয়া, তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাই আমার প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট।

সূরায় হিদায়াত শব্দের বিশ্লেষণ

এখানে হিদায়াতের অর্থ ইরশাদ ও তাওফীক অর্থাৎ সুপথপ্রদর্শন ও সক্ষমতা প্রদান।' অন্যত্র বলা হয়েছেঃ (وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ)

আর আমি তাদেরকে দু'টি পথ দেখিয়েছি। (৯০ নং সূরাহ্‌ বালাদ, আয়াত নং ১০) কখনো 'হিদায়াত' শব্দটি إِلَى-এর সাথে বা مُتَعَدِّىْ সকর্মক ক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ
(اِجْتَبٰىهُ وَ هَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ)

মহান আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল সঠিক পথে। (১৬ নং সূরাহ্ নাহল, আয়াত নং ১২১) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ
(فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ)

তাদেরকে দ্বারিত করো জাহান্নামের পথে। (৩৭ নং সূরাহ্ সাফফাত, আয়াত নং ২৩) এখানে হিদায়াতের অর্থ পথপ্রদর্শন ও রাস্তা বাতলে দেয়া। এরূপ ঘোষণা রয়েছেঃ

(وَ اِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ)

তুমি তো প্রদর্শন করো শুধু সরল পথ। (৪২ নং সূরাহ্ শুরা, আয়াত নং ৫২)

স্থিন বা দানবের কথা কুর'আন মাজীদে রয়েছেঃ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا)

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। (৭ নং সূরাহ্ আ'রাফ, আয়াত নং ৪৩) অর্থাৎ অনুগ্রহ পূর্বক সৎপথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর বিশ্লেষণ

(صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)-এর কয়েকটি অর্থ আছে। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনু তাবারী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট, সরল ও পরিষ্কার রাস্তা যার কোন জায়গা বা কোন অংশই বাঁকা নয়। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত যে, 'সিরাতুল মুস্তাকীম' হলো ঐ সরল-সঠিক পথ যার কোন শাখা-প্রশাখা নেই। উদাহরণ স্বরূপ , জারীর ইবনু আতিয়া আল-খাতাফীর একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

أميرُ المؤمنين على صِراطٍ ... إذا اعوج الموارِدُ مُسْتَقِيم

'বিশ্বাসীদের নেতা রয়েছেন সেই পথে যা সব সময়েই সরল-সঠিক। আর অন্যান্য পথে রয়েছে বক্রতা।' তাবারী (রহঃ) বলছেন, এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ রয়েছে। তারপর তিনি বলেনঃ 'আরবরা সিরাত শব্দটি বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে ব্যবহার করে থাকে, তা সৎ কাজের জন্য হোক অথবা অসৎ কাজের জন্য হোক। কিন্তু সৎ ব্যক্তির জন্য সঠিক এবং অসৎ ব্যক্তির বেলায় বক্র শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। কুর'আনে যে সরল-সঠিক পথের কথা বলা হয়েছে তা হলো ইসলাম। (তাফসীর তাবারী ১/১৭০)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাস্সিরগণ কর্তৃক এর ভিন্ন ভিন্ন বহু তাফসীর বর্ণিত হয়েছে যদিও তার সারকথা একই। আর তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করা। এটাও বর্ণিত আছে যে, তা হলো আল্লাহর কিতাব। যেমন ইবনু আবী হাতিম 'আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হচ্ছে মহান আল্লাহর কিতাব। ইবনু জারীর (রহঃ)-ও হামযা ইবনু যাইয়্যাত থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অবশ্য ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) আলী (রাঃ) থেকে মারফূ' সনদে বর্ণনা করেছেন যে, কিতাবুল্লাহ হচ্ছে মহান শক্ত রশি, জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ এবং সরল পথ বা صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। (জামি' তিরমিযী ৫/২৯০৬, সুনান দারিমী ২/৩৩৩১, মুসনাদ আহমাদ, ১/৯১, হাদীসটি অত্যন্ত য'ঈফ) আলী (রাঃ) থেকে এটা মাওকূফ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, আর এটাই অধিক উপযুক্ত। মহান আল্লাহই সঠিকটি ভালো জানেন। সুফইয়ান সাওরী (রহঃ)ও 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তা হলো ইসলাম।

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জিবরাইল (আঃ) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলুন। অর্থাৎ আমাদেরকে হিদায়াত বিশিষ্ট পথের সন্ধান দিন, আর তা হলো, আল্লাহর দ্বীন যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই।

মায়মূন ইবনু মিহরানও ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন তিনি বলেন, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হলো ‘ইসলাম’।

ইবনু মাস‘উদ, ইবনু ‘আব্বাস, জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ প্রমূখ সাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, صراط المستقيم হলো ‘ইসলাম’। ইবনু হানাফিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হলো, মহান আল্লাহর সেই দ্বীন যা ছাড়া অন্য দ্বীন গ্রহণীয় নয়। ‘আব্দুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলামও বলেন, صراط المستقيم হলো ‘ইসলাম’।

মুসনাদ আহমাদে একটি হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ

‘আল্লাহ তা‘আলা (صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)-এর একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তা এই যে সীরাতে মুস্তাকীমের দুই দিকে দু’টি প্রাচীর রয়েছে। তাতে কয়েকটি খোলা দরজা আছে। দরজাগুলোর ওপর পর্দা টাঙ্গানো রয়েছে। সীরাতে মুস্তাকীমের প্রবেশ দ্বারে সব সময়ের জন্য একজন আহ্বানকারী নিযুক্ত রয়েছে। সে বলছেঃ ‘হে জনমণ্ডলী! তোমরা সবাই এই সোজা পথ ধরে চলে যাও, আঁকা বাঁকা পথে যেয়ো না।’ ঐ রাস্তার ওপরে একজন আহ্বানকারী রয়েছে। যে কেউ এ দরজাগুলোর কোন একটি খুলতে চাচ্ছে সে বলছেঃ সাবধান, তা খুলনা, যদি খুলে ফেলো তাহলে সোজা পথ থেকে সরে পড়বে।’ সীরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে ইসলাম, প্রাচীরগুলো মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ, প্রবেশ দ্বারে আহ্বানকারী হচ্ছে আল কুর’আনুল কারীম এবং রাস্তার ওপরের আহ্বানকারী হচ্ছে মহান আল্লাহর ভয় যা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে উপদেষ্টা রূপে অবস্থান করে থাকে।’ (মুসনাদ আহমাদ ৪/১৮২) এ হাদীসটি মুসনাদ ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর ইবনু জারীর, জামি‘ তিরমিযী এবং সুনান নাসাঈতেও রয়েছে এবং এর সনদ হাসান সহীহ। মহান আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘হক বা সত্য।’ তাঁর এ কথাটিই সবচেয়ে ব্যাপক এবং এসব কথার মধ্যে পারস্পারিক কোন কোন বিরোধ নেই।

ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর (রহঃ) আবূ ‘আলিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ‘সীরাতে মুস্তাকীম’ হচ্ছে মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর পরবর্তী দুই সহচর। ‘আসিম (রহঃ) বলেন, উক্ত বিষয়টি আমরা হাসান বাসরী (রহঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আবুল ‘আলিয়া সত্যই বলেছেন এবং সঠিকতায় পৌছেছে। এ সবগুলো উক্তিই বিশুদ্ধ আপেক্ষিক। কেননা যে ব্যক্তি মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করবে এবং তাঁর অবর্তমানে আবূ বাকর ও ‘উমার (রাঃ)-এর আনুগত্য করবে প্রকৃত পক্ষে সে হাক এরই অনুসরণ করলো। আর যে হাক এর অনুসরণ করলো সে প্রকৃত অর্থে ইসলামেরই অনুসরণ করলো। আর যে ইসলামের অনুসরণ করলো সে প্রকৃত অর্থে কুর’আনের অনুসরণ করলো। আর কুর’আন হলো মহান আল্লাহর কিতাব ও সুদৃঢ় রশি এবং সঠিক পথ। অতএব প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ এবং একটি অন্যটির ওপর প্রমাণ বহন করে। যাবতীয় প্রসংশা মহান আল্লাহ জন্যই।

মু’মিনরাই হিদায়াতের আবেদন জানায়

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মু’মিনের তো পূর্বেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভ হয়ে গেছে, সুতরাং সালাতে বা বাইরে হিদায়াত চাওয়ার আর প্রয়োজন কি? তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এতে উদ্দেশ্য হিদায়াতের ওপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাওয়া। কেননা বান্দা প্রতিটি মুহূর্তে ও সর্বাবস্থায় প্রতিনিয়তই মহান আল্লাহর প্রতি আশাবাদী ও মুখাপেক্ষী। সে নিজে স্বীয় জীবনের লাভ ক্ষতির মালিক নয়। বরং নিশিদিন সে মহান আল্লাহরই প্রত্যাশী ও মুখাপেক্ষী। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন যে, সে যেন সর্বদা হিদায়াত প্রার্থনা করে এবং তার ওপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাইতে থাকে। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ তাঁর দরজায় ভিক্ষুক করে নিয়েছেন। সে মহান আল্লাহকে ডাকলে মহান আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার আকুল প্রার্থনা মঞ্জুর করার গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছেন। বিশেষ করে অসহায় ও মুহতাজ ব্যক্তি যখন দিনরাত মহান আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং প্রয়োজন পূরণের

প্রার্থনা জানায়, মহান আল্লাহ তখন তার সেই আকুল প্রার্থনা কবূলের জিম্মাদার হয়ে যান। মহান আল্লাহ কুর'আন মাজীদে বলেনঃ

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ)

হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো মহান আল্লার প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলো। (৪ নং সূরাহ্ নিসা, আয়াত নং ১৩৬) এ আয়াতে ঈমানদারগণকে ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া এমনই, যেমন হিদায়াত প্রাপ্তগণকে হিদায়াত চাওয়ার নির্দেশ দেয়। এই দুই স্থানেই উদ্দেশ্য হচ্ছে তার ওপরে অটল, অনড় ও দ্বিধাহীনচিত্তে স্থির থাকা। আর এমন কার্যাবলী সদা সম্পাদন করা যা উদ্দেশ্য লাভে সহায়তা করে। দেখুন মহান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাগণকে নিম্নের এ প্রার্থনা করারও নির্দেশ দিচ্ছেনঃ

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ)

হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত প্রদানকারী। (৩ নং সূরাহ্ আলি 'ইমরান, আয়াত নং ৮)

এটাও বর্ণিত আছে যে, আবূ বাকর সিদ্দিক (রাঃ) মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে সূরাহ ফাতিহার পর এ আয়াতটি নিম্ন স্বরে পড়তেন।

সুতরাং (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)-এর অর্থ দাঁড়ালোঃ 'হে মহান আল্লাহ! আমাদেরকে সরল ও সোজা পথের ওপর অটল ও স্থির রাখুন এবং তা থেকে আমাদেরকে দূরে অপসারিত করবেন না।'

সুরা: আল-ফাতিহা
আয়াত নং :-৬

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ

তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ, যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।

৬-৭ নং আয়াতের তাফসীর:

এর বর্ণনা পূর্বেই গত হয়েছে যে, বান্দার এ কথার ওপর মহান আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দার জন্য ঐ সব কিছুই রয়েছে যা সে চাবে।' এ আয়াতটি সীরাতে মুস্তাকীমের তাফসীর এবং ব্যাকরণবিদ বা নাহ্বীদের নিকট এটা 'সীরাতে মুস্তাকীম' হতে বদল হয়েছে এবং 'আতফ বায়ানও হতে পারে। মহান আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন। আর যারা মহান আল্লাহর পুরষ্কার লাভ করেছে তাদের বর্ণনা সূরাহ্ নিসার মধ্যে এসেছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

(وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا)

আর যে কেউ মহান আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সাথী হবে যাদের প্রতি মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীল; আর এরাই সর্বোত্তম সাথী। এটাই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং মহান আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট। (৪ নং সূরাহ্ নিসা, আয়াত নং ৬৯-৭০)

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'হে মহান আল্লাহ! আপনি আমাকে ঐ সব ফিরিশতা, নবী, শহীদ এবং সৎলোকের পথে পরিচালিত করুন যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও 'ইবাদতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন।'

উল্লিখিত আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতোঃ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ 'আর যে কেউ মহান আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সাথী হবে যাদের প্রতি মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন;'

আবূ জা'ফর আর রাযী (রহঃ) রাবী' ইবনু আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবীগণ। ইবনু জরাইজ ও মুজাহিদ (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বলেন যে, صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মু'মিনগণ। আল ওয়াকী' (রহঃ) বলেন, তারা হলো মুসলিমগণ। আর 'আব্দুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) বলেন, তারা হলো নবী এবং তার সাথীবর্গ। এ সবের মধ্যে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীরটিই বেশি ব্যাপক এবং সর্ববিষয়কে অন্তর্ভুক্তকারী। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ এই বাক্যেও غير নামক শব্দটিতে জামহূরগণ রা (ر) অক্ষরে যের দিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছেঃ 'হে মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল সোজা পথপ্রদর্শন করুন, ঐ সব লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুর®কৃত করেছেন, যারা হিদায়াত বা সুপথ প্রাপ্ত এবং অটল অবিচল ছিলেন এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুগত ছিলেন। যারা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে-বহুদূরে অবস্থানকারী ছিলেন। আর ঐ সব লোকের পথ হতে রক্ষা করুন যাদের ওপর আপনার ধূমায়িত ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, যারা সত্যকে জেনে শুনেও তা থেকে দূরে সরে গেছে এবং পথভ্রষ্ট লোকদের পথ থেকেও আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন যাদের সঠিক পথ সম্পর্কে কোন ধারণা ও জ্ঞানই নেই, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং তাদেরকে সরল, সঠিক সাওয়াবের পথ দেখানো হয় না। আর বাক্যে لا (লা) দ্বারা তাকিদ করা হয়েছে এই জন্য যে, যেন তা এ বিষয়ের প্রমাণ করে যে, এখানে দু'টি ভুল পথ রয়েছে আর তাহলো ইয়াহূদ ও খ্রিষ্টানদের পথ।

কেউ কেউ মনে করেন যে, এখানে غير শব্দটি ইসতেছনা বা প্রভেদ সৃষ্টি করার জন্য এসেছে। অতএব তা استثناء منقطع হবে। কেননা যাদের ওপর অনুগ্রহ করা হয়েছে তাদের মধ্য হতে এ প্রভেদ হচ্ছে অথচ তারা তাদের অন্তর্ভুক্তই ছিলো না। তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি সেটাই সর্বাধিক উত্তম। যেমন কবির উক্তিঃ

كأنّك من جِمال بني أقَيش ... يُقَعْقَعُ عند رِجْلَيْه بشَنّ (٥).

মূলত 'ইবারাতটি হওয়ার কথা ছিলোঃ

كأنّك جمل من جِمال بني أقَيش ... يُقَعْقَعُ عند رجْلَيْه بشَنّ.

অতঃপর মাওসূফকে বিলুপ্ত করে সিফাতের ওপরই যথেষ্ট করা হয়েছে। আর এ রূপই হলো غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ। এর ভাবার্থ হলো, غَيْرِ صِرَاطِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ অভিশপ্তদের পথে নয়। মুযাফ ইলাই উল্লেখ করে মুযাফ উল্লেখ না করার ওপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে। আর এ কথাগুলোর পক্ষে পূর্ববর্তী বাক্যগুলোই প্রমাণ বহন করে। আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণীঃ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এরপর মহান আল্লাহ বললেনঃ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ।

আবার কেউ কেউ لا (লা) কে অতিরিক্ত বলেছেন। তাদের মতে বাক্যটির মূলরূপ ছিলোঃ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ الضَّآلِّيْنْ তারা কবি আজ্জাজের পংক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কবি বলেনঃ في بئْر لا حُورٍ سرى وما شَعَر এখানে لا (লা) অব্যয়টি অতিরিক্ত। তবে বিশুদ্ধ তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তাইতো 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ غَيْرِ الضَّآلِّيْنْ পড়তেন বলেও বর্ণনা এসেছে। যা আবূ 'উবাইদ আল কাসিম ইবনু সাল্লাম স্বীয় 'ফাযায়িলুল কুর'আন' এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর এর সনদটিও সহীহ। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, তিনিও উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর মতো পড়তেন। যদি তাদের দুজন থেকে বর্ণিত বিষয়টিকে ব্যাখ্যা হিসেবেও গণ্য করা হয় তথাপিও তা আমাদের মতটিকেই সাব্যস্ত করার প্রতি একটি প্রমাণ বহন করে যে, এ বাক্যে لا (লা) দ্বারা তাকিদ করা হয়েছে এই জন্য যে, যাতে এ সন্দেহ না থাকে যে, اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর ওপর 'আতফ করা হয়েছে। আর একটি কারণ হলো এই যে, দু'টি ভুল পথের পার্থক্যও অনুধাবন করে তা থেকে বিরত থাকা যায়।

ঈমানদারদের পন্থা তো এটাই যে, সত্যের জ্ঞান থাকতে হবে এবং তার 'আমলও থাকতে হবে। ইয়াহূদীদের 'আমল নেই এবং খ্রিষ্টানদের জ্ঞান নেই। এ জন্যই ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত হলো এবং খ্রিষ্টানরা হলো পথভ্রষ্ট। কেননা জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে 'আমল পরিত্যাগ করা লা'নত বা অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ (مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ)

ইয়াহূদীদেরকে মহান আল্লাহ অভিশাম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি তিনি গযব নাযিল করেছেন। (৫ নং সূরাহ্ মায়িদাহ, আয়াত নং ৬০)

খ্রিষ্টানরা যদিও একটা জিনিসের ইচ্ছা করে, কিন্তু তার সঠিক পথ তারা পায় না। কেননা তাদের কর্ম পন্থা ভুল এবং তারা সত্যের অনুসরণ হতে দূরে সরে পড়েছে। অভিশাপ ও পথভ্রষ্টতা এই দুই দলের তো রয়েছেই, কিন্তু ইয়াহূদীরা অভিশাপের অংশে একধাপ এগিয়ে রয়েছে। যেমন কুর'আনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ (قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ)

খ্রিষ্টানরা অতীতে নিজেরা ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকেও ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে। (৫ নং সূরাহ্ মায়িদাহ, আয়াত নং ৭৭)

এ কথার সমর্থনে বহু হাদীস ও বর্ণনা পেশ করা যেতে পারে। মুসনাদ আহমাদে আছে যে, 'আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেনাবাহিনী একবার আমার ফুফুকে এবং কতকগুলো লোককে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাযির করেন। আমার ফুফু তখন বললেনঃ 'আমাকে দেখা-শোনা করার লোক দূরে সরে রয়েছে এবং আমি একজন অধিক বয়স্ক অচল বৃদ্ধা। আমি কোন খিদমাতের যোগ্য নই। সুতরাং দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। মহান আল্লাহ আপনার ওপরও দয়া করবেন।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'যে তোমার খবরাখবর নিয়ে থাকে সে ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেনঃ 'আদী ইবনু আবী হাতিম।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 'সে কি ঐ ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে? তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে আরেকটি লোক ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি 'আলীই (রাঃ) ছিলেন। তিনি আমার ফুফুকে বললেনঃ 'যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সাওয়ারীর প্রার্থনা করো।' আমার ফুফু তার কাছে প্রার্থনা জানালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সাথে তা মঞ্জুর করেন এবং তিনি সাওয়ারী পেয়ে যান। তিনি এখান থেকে মুক্তি লাভ করে সোজা আমার নিকট চলে আসেন এবং বলেনঃ ' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দানশীলতা তোমার পিতা হাতিমকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর কাছে একবার কেউ গেলে আর শূন্য হাতে ফিরে আসে না।' এ কথা শুনে আমিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে হাযির হই। আমি দেখি যে, ছোট ছেলে ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে অবাধে যাতায়াত করছে এবং তিনি তাদের সাথে অকুণ্ঠচিত্তে অকৃত্রিমভাবে আলাপ-আলোচনা করছেন। এ অবস্থা দেখে আমার বিশ্বাস হলো যে, তিনি কাইসার ও কিসরার মতো বিশাল রাজত্ব ও সম্মানের অভিলাষী নন। তিনি আমাকে দেখে বলেনঃ 'আদী! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা হতে পালিয়ে বেড়াচ্ছো কেন? মহান আল্লাহ ব্যতীত

অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য আছে কি? মহাসম্মানিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা থেকে বড় আর কেউ আছে কি?' তাঁর এই কথাগুলো এবং তাঁর সরলতা ও অকৃত্রিমতা আমার ওপর এমনভাবে দাগ কাটলো ও ক্রিয়াশীল হলো যে তৎক্ষণাৎ আমি ইসলাম কবূল করলাম এবং দেখতে পেলাম যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখমণ্ডল আনন্দে রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে। তিনি বললেনঃ

المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى

'যারা মহান আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে তারা হলো ইয়াহূদী এবং যারা ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তারা হলো খ্রিষ্টান।' এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-ও বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান গারীব বলেছেন। (মুসনাদ আহমাদ ৪/৩৭৮, জামি' তিরমিযী ৮/২৮৯। হাদীসটি সহীহ) আমি বলবো (ইবনু কাসীর) এরূপ বর্ণনা হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (রহঃ) 'আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মহান আল্লাহর বাণী المغضوب عليهم সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, তারা হলো ইয়াহূদী আর ولا الضالين সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, তারা হলো النصارى هم الضالون অর্থাৎ নাসারা তথা খ্রিষ্টানগণ হচ্ছে ضالون বা পথভ্রষ্ট। সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ (রহঃ)ও আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করা হয়েছে।

'আব্দুর রায্যাক (রহঃ) মা'মার থেকে তিনি বুদাইলীল 'উকাইলী থেকে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বানূ কাইনের একটি লোক 'ওয়াদিউল কুরায়' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘোড়ায় আরোহন অবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল তারা কারা? তিনি বললেন مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ এবং ইশারা করলেন ইয়াহূদীর দিকে النصارى هم الضالون অর্থাৎ নাসারা তথা খ্রিষ্টানগণ হচ্ছে ضالون বা পথভ্রষ্ট। (মুসনাদ আহমাদ, ৫/৭৭। ইবনু জারীর স্বীয় তাফসীরে ১/৬১। তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ১/২৯। হাদীস সহীহ) জুরাইরী, 'উরওয়াহ এবং খালিদ আল হায্যা (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক থেকে মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা কেউই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শ্রবনকারীর নাম উল্লেখ করেন নি। আর 'উরওয়ার বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক এর স্থলে 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর এসেছে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

ইবনু মারদুয়াই 'আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক এর সূত্রে আবূ যার (রাঃ) থেকে মারফূ' সনদে বর্ণনা করেছেন, আবূ যার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে المغضوب ও الضالون সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, ইয়াহূদ ও নাসারা।

সুদ্দী (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ও মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যনা অনেকগুলো সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ হলো ইয়াহূদ আর ولا الضالين হলো নাসারা। এ হাদীসের আরো অনেক সনদ আছে এবং বিভিন্ন শব্দে সে সব বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, মুফাস্সিরগণের মাঝে এ প্রসঙ্গে কোন মতভেদ আছে বলে আমি জানি না। ইমামগণের তাফসীরের পক্ষে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের পাশাপাশি নিচের আয়াতটিও একটি দালীল, যা মহান আল্লাহ বানূ ইসরাঈলকে সম্মোধন করে বলেছেনঃ

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

'তা কতোই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, তা এই যে, মহান আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, জিদের বশে তারা তা প্রত্যাখ্যান করতো শুধু এজন্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। অতএব তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধের পাত্র হলো এবং কাফিরদের জন্যই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' (২ নং সূরাহ বাকারার আয়াত নং ৯০) মহান আল্লাহ সূরাহ মায়িদাতে বলেছেনঃ

(قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَاۗءِ السَّبِيْلِ)

‘বলো, আমি তোমাদের কি এর চেয়ে খারাপ কিছুর সংবাদ দিবো যা মহান আল্লাহর নিকট প্রতিদান হিসেবে আছে? আর তা হলো যাকে মহান আল্লাহ লা‘নত করেছেন, যার ওপর তিনি ক্রোধানি¦ত হয়েছেন, যাদের কতককে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন। আর যারা তাগুতের ‘ইবাদত করেছে মর্যাদায় তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর সরল সত্য পথ থেকে সবচেয়ে বিচ্যুত।’ (৫ নং সূরাহ আল মায়িদাহ, আয়াত-৬১) মহান আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেনঃ

(لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ)

‘বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিলো তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ‘ঈসার মুখে উচ্চারিত কথার দ্বারা অভিশাপ দেয়া হয়েছে। এটা এ জন্য যে তারা অমান্য করেছিলো আর তারা ছিলো সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যে সব অসৎকর্ম করতো তা থেকে একে অন্যকে নিষেধ করতো না। তারা যা করতো তা কতোই না নিকৃষ্ট!’ (৫ নং সূরাহ আল মায়িদাহ, আয়াত-৭৮ও ৭৯)

ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, যায়দ ইবনু ‘আমর ইবনু নুফায়িল যখন খাঁটি ধর্মের অনুসন্ধানে স্বীয় বন্ধু-বান্ধব ও সাথী-সঙ্গীসহ বেরিয়ে পড়েন এবং এদিক-ওদিক বিচরণের পর শেষে সিরিয়ায় এলেন। তখন ইয়াহূদীরা তাঁদেরকে বললোঃ ‘মহান আল্লাহর অভিশাপের কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মে আসতেই পারবেন না।’ তাঁরা উত্তরে বললেনঃ ‘তা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যেই তো আমরা সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে বের হয়েছি, কাজেই কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারি?’ তাঁরা খ্রিষ্টানদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা বললোঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার লা‘নত ও অসন্তুষ্টির কিছু অংশ নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মেও আসতে পারবেন না।

তাঁরা বললেনঃ ‘আমরা এটাও করতে পারি না।’ তারপর যায়দ ইবনু ‘আমর ইবনু নুফাইল স্বাভাবিক ধর্মের ওপরই রয়ে গেলেন। তিনি মূর্তি পূজা ও স্বগোত্রীয় ধর্মত্যাগ করলেন, কিন্তু ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান ধর্ম কোনক্রমেই গ্রহণ করলেন না। তবে তাঁর সঙ্গী সাথীরা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলো, কেননা ইয়াহূদীদের ধর্মের সাথে এর অনেক মিল ছিলো। যায়দের ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ওয়ারাকা ইবনু নাওফিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাবুওয়াতের যুগ পেয়েছিলেন এবং মহান আল্লাহর হিদায়াত তাঁকে সুপথপ্রদর্শন করেছিলো। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান এনেছিলেন ও সেই সময় পর্যন্ত যে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিলো তিনি তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ضاد এবং ظا এর মাঝে উচ্চারণগত পার্থক্য

উলামায়ি কিরামের সহীহ মাযহাব এইযে, ضاد এবং ظا এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও তা পাশাপাশি মাখরাজ হওয়ার কারণে এ পার্থক্য ক্ষমার্হ। ضاد এর সহীহ মাখরাজ হলো জিহবার প্রথম প্রান্ত এবং তার পার্শ্বের চোয়াল। আর ظاء এর মাখরাজ হচ্ছে জিহবার একদিক এবং সামনের ওপরের দু’দাঁতের প্রান্ত।

দ্বিতীয়তঃ এই দু’টি অক্ষর হচ্ছে رخوة مجهورة এবং مطبقه। সুতরাং যে ব্যক্তির পক্ষে এই দু’টি অক্ষরের মাঝে পার্থক্য করা কঠিন হবে সে যদি ضاد কে ظا এর মতো পড়লে তার অপরাধটি মার্জনীয় হবে। হাদীসে আছে যে, মহানবী বলেছেনঃ أَنَا أَفْصَحُ مِنْ نُطْقِ بِالضَّادِ ‘আমি ضاد কে সবচেয়ে সঠিকভাবে পড়তে পারি।’ কিন্তু হাদীসটি য‘ঈফ ও ভিত্তিহীন। (কাশফুল খাফা- প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৩২। ইমাম শাওকানী (রহঃ) ফাওয়াফয়দুল মাজমূআতে বর্ণনা করেছেন। হাদীস নং ১০২০, ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই তবে অর্থ সহীহ) মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

সূরাহ্ ফাতিহার সার সংক্ষেপ

এই কল্যাণময় বরকতপূর্ণ সূরাহ টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সমষ্টি। এই সাতটি আয়াতে মহান আল্লাহর জন্য উপযুক্ত প্রশংসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্র নামসমূহ এবং উচ্চতম বিশেষণের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। সাথে সাথেই কিয়ামত দিবসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং বান্দাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, তারা যেন সেই মহান প্রভুর নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে যাঞ্চা করে, যেন তাঁর কাছে নিজের দারিদ্রতা ও অসহায়ত্বের কথা অকপটে স্বীকার করে, তাঁকে সব সময় অংশীবিহীন ও তুলনাবিহীন মনে করে, খাঁটি অন্তরে তাঁর 'ইবাদত; তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করে, তাঁর কাছে সরল সোজা পথ ও তাঁর ওপর সুদৃঢ় ও অটল থাকার জন্য নিশিদিন আকুল প্রার্থনা জানায়। এই অবিসংবাদিত পথই একদিন তাকে কিয়ামতের দিন পুলসিরাতও পার করাবে এবং নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ লোকদের পাশে জান্নাতুল ফিরদাউসের নন্দ কাননে স্থান দিবে। সাথে সাথে আলোচ্য সূরাহ টির মধ্যে যাবতীয় সৎকার্যাবলী সম্পাদনের প্রতি নিরন্তর উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যাতে কিয়ামতের দিন বান্দা আত্মকৃত সাওয়াবসমূহ সাথে নিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া মিথ্যা ও অন্যায় পথে চলার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে কিয়ামত দিবসেও সে বাতিলপন্থীদের দল থেকে দূরে থাকতে পারে। আর সেই বাতিল পন্থিদল হচ্ছে ইয়াহূদ ও খ্রিষ্টান।

নি'য়ামত হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান

ধীর স্থির ও সূক্ষ্মভাবে জাগ্রত মস্তিষ্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে অতি সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, মহান আল্লাহর বর্ণনারীতি কি সুন্দর! আলোচ্য সূরায় اَنْعَمْتَ নামক ব্যাক্যাংশে দানের ইসনাদ বা সম্পর্ক মহান আল্লাহর দিকে করা হয়েছে এবং اَنْعَمْتَ বলা হয়েছে। কিন্তু غَضَبِ-এর সম্পর্ক করা হয়নি; বরং এখানে কর্তাকেই লোপ করা হয়েছে এবং مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলা হয়েছে। এখানে বিশ্ব প্রভুর মহান মর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে মূল কর্তা আল্লাহ তা'আলাই। যেমন অন্যস্থানে বলা হয়েছেঃ (اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ)

তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য করোনি, যারা মহান আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে? (৫৮ নং সূরাহ্ মুজাদালাহ, আয়াত নং ১৪)

এরূপভাবেই ভ্রষ্টতার পরিণতি পথভ্রষ্টের দিকেই করা হয়েছে। অথচ অন্য এক জায়গায় আছেঃ

(مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا)

মহান আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনো তার কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। (১৮ নং সূরাহ্ কাহফ, আয়াত নং ১৭) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ (مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗؕ وَ يَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ)

মহান আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (৭ নং সূরাহ্ আ'রাফ, আয়াত নং ১৮৬)

এ রকমই আরো বহু আয়াত রয়েছে যা দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পথপ্রদর্শনকারী ও পথ বিভ্রান্তকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ।

কাদরিয়্যাহ দল, যারা কতকগুলো অস্পষ্ট আয়াতকে দালীলরূপে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, বান্দা তার ইচ্ছাধীন ও মুক্ত স্বাধীন, সে নিজেই পছন্দ করে এবং নিজেই সম্পাদন করে। কিন্তু তাদের এ কথা ভ্রমাত্মক ও প্রমাদপূর্ণ। এটা খণ্ডনের জন্য ভূরি ভূরি আয়াতসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বাতিল পন্থীদের এটাই রীতি যে, তারা স্পষ্ট আয়াতকে পরিহার করে অস্পষ্ট আয়াতের পিছনে লেগে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছেঃ

إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ.

‘যখন তোমরা এ লোকদেরকে দেখো যারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে লেগে থাকে তখন বুঝে নিবে যে, তারা ওরাই যাদের নাম স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিয়েছেন এবং স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থেকো।’ (সহীহুল বুখারী, হাদীস- ৮/৪৫৪৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৯৪৬, ইবনু মাজাহ, ১/৪৭, আবূ দাউদ, ৪/৪৫৯৮, দারিমী -১/১৪৫) এ নির্দেশনামায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইঙ্গিত এই আয়াতের প্রতি রয়েছেঃ

(فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَأْوِيْلِهٖ)

‘অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, মূলত তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের অনুসরণ করে।’ (৩ নং সূরাহ্ আলি ‘ইমরান, আয়াত নং ৭)

সুতরাং মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, বিদ‘আতীদের অনুকূলে কুর’আনুল কারীমের মধ্যে সঠিক ও অকাট্য দালীল একটিও নেই। কুর’আন মাজীদের আগমন সূচিত হয়েছে সত্য ও মিথ্যা, হিদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই। বৈপরীত্য ও মতবিরোধের জন্য আসেনি বা তার অবকাশও এতে নেই। এতো মহাবিজ্ঞ ও প্রশংসিত মহান আল্লাহ কর্তৃক লাওহে মাহফূয বা সংরক্ষিত ফলক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমীন বলা প্রসঙ্গ

সূরাহ্ ফাতিহা শেষে আমীন বলা মুস্তাহাব। آمِيْن শব্দটি يَاسِيْنَ শব্দটির মতো এবং এটা آمِيْن ও পড়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছেঃ ‘হে মহান আল্লাহ! আপনি কবূল করুন।’ আমীন বলা মুস্তাহাব হওয়ার দালীল হলো ঐ হাদীসটি যা মুসনাদ আহমাদ, আবূ দাউদ এবং জামি‘ তিরমিযীতে ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ)পড়ে আমীন বলতে শুনেছি। তিনি স্বর দীর্ঘ করতেন।’ (মুসনাদ আহমাদ ৪/৩১৬, আবূ দাউদ ১/৯৩২, তিরমিযী ২/২৪৮, হাদীস সহীহ) সুনান আবূ দাউদে আছে যে, তিনি স্বর উচ্চ করতেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। ‘আলী (রাঃ), ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বশব্দ আমীন তাঁর নিকটবর্তী প্রথম সারির লোকেরা স্পষ্টতই শুনতে পেতেন। (সুনান আবূ দাউদ ১/৯৩৪, ইবনু মাজাহ ১/৮৫৩, দারাকুতনী ১/৩৩৫, কানযুল ‘উম্মাল ১৭৯০৪। বিভিন্ন জন য‘ঈফ বলেছেন, আর ইবনু হিব্বান অন্য একটি সনদেও স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আলবানী (রহঃ) বিভিন্ন সনদের ভিত্তিতে মতন কে جيد তথা উত্তম বলেছেন)

সুনান আবূ দাউদ ও সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এটাও আছে যে, ‘আমীনের শব্দে মাসজিদ প্রতিধ্বনিত হয়ে বেজে উঠে।’ (সুনান আবূ দাউদ ১/৯৩৭, ইবনু মাজাহ ১/২৭৯) ইমাম দারাকুতনীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে ‘হাসান’ বলে মন্তব্য করেছেন।
আরো বর্ণিত আছে যে, বিলাল (রাঃ) বললেনঃ ‘হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি সালাতে যোগ দেয়ার পূর্বে ‘আমীন’ বলা শেষ করবেন না।’ (সুনান আবূ দাউদ ১/৯৩৭, দারাকুতনী ১/৩৩৫, মুসনাদ আহমাদ ৬/১২, ১৫, হাদীস য‘ঈফ) সালাতের বাইরে থাকলেও ‘আমীন’ বলতে হবে। তবে যে ব্যক্তি সালাতে থাকবে তার জন্য বেশি জোর দেয়া হয়েছে। সালাত আদায়কারী একাকী হোক বা মুক্তাদী হোক বা ইমাম হোক, সর্বাবস্থায় তাকে আমীন বলতেই হবে।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

‘ইমাম যখন ‘আমীন’ বলে তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলো। কেননা যার এ আমীন বলা ফিরিশতাগণের আমীন বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মা‘ফ করে দেয়া হয়।’ (সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৮২, ৪৪৭৫; আ.প্র. হাঃ

৭৩৮, ই.ফা. হাঃ ৭৪৬। ফাতহুল বারী ১১/২০৩, সহীহ মুসলিম ১/৩০৭, ৯৪২) সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ آمِينَ. وَالْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে এবং ফিরিশতাগণও আমীন বলে তখন ফিরিশতার আমীন বলার সাথে যাদের আমীন বলা মিলে যাবে তাদের পিছনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।’ (সহীহ মুসলিম ১/৩০৭, ৯৪৪)

এর ভাবার্থ এই যে, তার ‘আমীন’ ও ফিরিশতার ‘আমীন’ বলার সময় একই হয় বা কবূল হওয়া হিসেবে অনুরূপ হয় অথবা আন্তরিকতায় অনুরূপ হয়।

সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) থেকে মারফূ‘ রূপে বর্ণিত আছেঃ ইমাম যখন (وَلَا الضَّآلِّيْنَ)বলেন তখন তোমরা ‘আমীন’ বলো, মহান আল্লাহ দু‘আ কবূল করবেন।’ (সহীহ মুসলিম ১/৩০৩)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, آمِيْن এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, হে মহান আল্লাহ! তুমি কবূল করো। জাওহারী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো যেন এরূপই হয়।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ ‘আমাদের আশা ভঙ্গ করবেন না।’ অধিকাংশ ‘আলিম বলেন যে,

এর অর্থ হলোঃ ‘হে মহান আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রার্থনা কবূল করুন।’

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) মুজাহিদ, জা‘ফর সাদিক ও হিলাল ইবনু ইয়াসাফ (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নিশ্চয় آمِيْن হলো মহান আল্লাহর নাম সমূহের একটি নাম। আবূ বাকর ইবনু ‘আরবী বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকেও মারফূ‘ সূত্রে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তা সহীহ নয়।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর শিষ্যবৃন্দ বলেন যে, ইমাম ‘আমীন’ বলবে না, শুধু মুক্তাদীগণ আমীন বলবে। কেননা ইমাম মালিক (রহঃ) স্বীয় মুওয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন যা আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"وَإِذَا قَالَ يَعْنَيْ الْإِمَامُ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا: آمِيْن

আর যখন ইমাম وَلَا الضَّآلِّيْن বলবে তখন তোমরা ‘আমীন’ বলো। (সহীহুল বুখারী, ২/৭৮২, সুনান আবূ দাউদ, ১/৯৩৫, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, ১/৪৫, মুসনাদ আহমাদ, ২/৪৫৯) আর এর সমর্থনে তারা আবূ মূসা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিও উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো,

وَإِذَا قَرَأَ:وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا: آمِيْن.

আর যখন তিনি অর্থাৎ ইমাম وَلَا الضَّآلِّيْن পড়বে তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলো। (মুসনাদ আহমাদ, ৬/১৩৫, অত্র হাদীসে ইমাম আহমাদের ওস্তায ‘আলী ইবনু ‘আসিম অত্যধিক ভুল করার কারণে মুহাদ্দিসগণ তার সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন) অবশ্য পূর্বেই আমরা সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছি,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا.

অর্থাৎ ‘ইমাম যখন ‘আমীন’ বলে তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলো। (সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৮২, ৪৪৭৫; আ.প্র. হাঃ ৭৩৮, ই.ফা. হাঃ ৭৪৬। ফাতহুল বারী ১১/২০৩, সহীহ মুসলিম ১/৩০৭, ৯৪২) তাছাড়া স্বয়ং মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম)-এরও 'আমল ছিলো যে, তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ পড়ে 'আমীন' বলতেন। (সহীহুল বুখারী হাঃ ১ম ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা; সহীহ মুসলিম ১৭৬ পৃষ্ঠা। সুনান আবূ দাঊদ ১৩৪ পৃষ্ঠা। জামি' তিরমিযী ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা। সুনান নাসাঈ ১৪০ পৃষ্ঠা। সুনান ইবনু মাজাহ ৬২ পৃষ্ঠা। মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম খণ্ড ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ১০৮ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১ম ২৮৭ পৃষ্ঠা। যাদুল মা'য়াদ ১ম খণ্ড ১৩২ পৃষ্টা। হিদায়া দিরায়াহ ১০৮ পৃষ্ঠা। মিশকাতুল মাসাবীহ নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদ্রাসা পাঠ্য হাদীস নং ৭৬৮-৭৮৭। সহীহুল বুখারী হাঃ 'আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৫৩, সহীহুল বুখারী হাঃ আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৩৬-৭৩৮, সহীহুল বুখারী হাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১ম খণ্ড অনুচ্ছেদসহ হাদীস নং ৭৪১-৭৪৩। সহীহ মুসলিম ইঃ ফাঃ ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৯৭-৮০৪ পর্যন্ত। সুনান আবূ দাঊদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৯৩২। জামি' তিরমিযী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১ম হাদীস নং ২৪৮ বুলূগুল মারাম বাংলা ৮৫ পৃষ্ঠা কিমিয়ায়ে সা'আদাত ১ম খণ্ড ১৯০ পৃষ্ঠা। ইসলামিয়াত বি-এ হাদীস পর্ব-১৫৭ পৃষ্ঠা)

যিহরী সালাতে মুক্তাদীগণের 'আমীন' বলার বিধান

যিহরী সালাতে মুক্তাদী উচ্চস্বরে 'আমীন' বলবে না নীরবে 'আমীন' বলবে এ ব্যাপারে আমাদের সহচরবৃন্দের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। মতভেদের সারকথা হলো, ইমাম যদি 'আমীন' বলতে ভুলে যায় তাহলে মুক্তাদীগণ উচ্চস্বরে 'আমীন' বলবে। কিন্তু যদি ইমাম নিজেই উচ্চস্বরে 'আমীন' বলেন, তবে নতুন কথা মতে মুক্তাদীগণ উচ্চস্বরে 'আমীন' বলবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাব এটাই। ইমাম মালিক (রহঃ) থেকেও এরূপ বর্ণনা আছে। তাঁদের মতে অন্যান্য যিকরের ন্যায় এটা একটি যিকর। তাই সালাতের অন্যান্য যিকরের ন্যায় এটাও স্বশব্দে না হয়ে চুপে চুপে হবে। আর পুরাতন কথা হলো মুক্তাদীগণও উচ্চস্বরে 'আমীন' বলবে। আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ)-এর মাযহাব এটাই। আর এটা ইমাম মালিক (রহঃ)-এর দু'টি মতের দ্বিতীয় মত। কেননা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, حَتَّى يَرْتَجَّ الْمَسْجِدُ 'এমনকি মাসজিদ আমীনের শব্দে প্রকম্পিত হতো।'

আমাদের তৃতীয় আরেকটি মত হলো, মাসজিদ যদি ছোট হয় তাহলে মুক্তাদীগণ উচ্চস্বরে 'আমীন' বলবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে তারা ইমামের ক্বিরা'আত শুনতে পায়। আর মাসজিদ যদি বড় হয় তাহলে মুক্তাদীগণ উচ্চস্বরে 'আমীন' বলবে। যাতে মাসজিদের প্রান্তসীমা পর্যন্ত 'আমীন' এর শব্দ পৌছে যায়। মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। (যিহ্রী সালাতে উঁচুস্বরে আমীন না বলা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের 'আমলের বিপরীত, বরং ইমাম ও মুক্তাদির সকলেরই সরবে আমীন বলতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিহ্রী সালাতে উঁচুস্বরে আমীন বলতেন এবং ইমাম যখন আমীন বলে তখন মুক্তাদিকে আমীন বলার নির্দেশ দিতেন, যেমন ৭৮০ নং হাদীসে বর্ণিত। এছাড়াও জামি' তিরমিযীতে বর্ণিত আছেঃ

قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ (রাঃ) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ.

ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে "গায়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন" পড়তে শুনেছি। তারপর তিনি নিজের স্বরকে উচ্চ করে আমীন বলেছেন।

(সহীহুল বুখারী হাঃ ১ম ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা; সহীহ মুসলিম ১৭৬ পৃষ্ঠা। সুনান আবূ দাঊদ ১৩৪ পৃষ্ঠা। জামি' তিরমিযী ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা। সুনান নাসাঈ ১৪০ পৃষ্ঠা। সুনান ইবনু মাজাহ ৬২ পৃষ্ঠা। মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম খণ্ড ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ১০৮ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১ম ২৮৭ পৃষ্ঠা। যাদুল মা'য়াদ ১ম খণ্ড ১৩২ পৃষ্টা। হিদায়া দিরায়াহ ১০৮ পৃষ্ঠা। মিশকাতুল মাসাবীহ নূর মোহাম্মদ আযমী ২য় খণ্ড ও মাদ্রাসা পাঠ্য হাদীস নং ৭৬৮-৭৮৭। সহীহুল বুখারী হাঃ 'আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৪৫৩, সহীহুল বুখারী হাঃ আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৩৬-৭৩৮, সহীহুল বুখারী হাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১ম খণ্ড অনুচ্ছেদসহ হাদীস নং ৭৪১-৭৪৩। সহীহ মুসলিম ইঃ ফাঃ ২য় খণ্ড হাদীস নং ৭৯৭-৮০৪ পর্যন্ত। সুনান আবূ দাঊদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৯৩২। জামি' তিরমিযী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১ম হাদীস নং ২৪৮ বুলূগুল মারাম বাংলা ৮৫ পৃষ্ঠা কিমিয়ায়ে সা'আদাত ১ম খণ্ড ১৯০ পৃষ্ঠা। ইসলামিয়াত বি-এ হাদীস পর্ব-১৫৭ পৃষ্ঠা)

সাহাবীদের উঁচুস্বরে ‘আমীন’ বলাঃ

وَقَالَ عَطَاءٌ آمِينَ دُعَاءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً.

‘আত্বা বলেনঃ “আমীন একটি দু‘আ। ইবনু যুবায়র (রাঃ) আমীন বলেছেন এবং তাঁর পিছনের লোকেরাও বলেছেন এমনকি মাসজিদ আমীন ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হয়েছিলো।” (সহীহুল বুখারী হাঃ, তাগলীকুত তা‘লীক ২/৩১৮, হাফিয ইবনু হাজার]

ইবনু মারদুওয়াই আহমাদ ইবনু হাসান থেকে তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সালাম থেকে তিনি ইসহাক ইবনু ইবরাহীম থেকে তিনি জারীর থেকে তিনি লাইস থেকে তিনি ইবনু আবূ সুলাইম থেকে তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যেঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলে ‘আমীন’ বলে, তখন যমীন বাসীর আমীনের সাথে আকাশ বাসীর আমীন মিলে গেলে আল্লাহ তা‘আলা বান্দার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর যে ব্যক্তি ‘আমীন’ বলে না তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করার পর যুদ্ধলব্ধ গণীমত নিজ নিজ অংশ নির্ণয়ের লক্ষ্যে লটারী করলে সবার অংশ বের হয়ে আসলেও তার নাম টি বের হয়ে আসলে জিজ্ঞেস করলো যে, আমার অংশ বের হয়ে আসলো না কেন? উত্তরে তাকে বলা হলো এর কারণ হলো তুমি ‘আমীন’ বলো নি। (অত্র হাদীসের সনদে ‘ইবনু আবূ সুলাইম’ একজন স্মৃতি বিভ্রাট ও তাদলীসের দোষে অভিযুক্ত রাবী। সুতরাং হাদীসটি য‘ঈফ)

এটা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সঠিক ও দৃঢ় পথের প্রথম পরিচয়। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র নিকট হতে যে পথ নাযিল হয়েছে, তা অনুসরণ করলে আল্লাহ্‌র রহমত ও নিয়ামত লাভ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ তা এমন কোন পথই নয়, যাহা আজ সম্পূর্ণ নূতনভাবে পেশ করা হচ্ছে- পূর্বে পেশ করা হয় নি। বরং তা অতিশয় আদিম ও চিরন্তন পথ। মানুষের এই কল্যাণের পথ অত্যন্ত পুরাতন, ততখানি পুরাতন যতখানি পুরাতন হচ্ছে স্বয়ং মানুষ। প্রথম মানুষ হতেই এটা মানুষের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে, অসংখ্য মানুষ এ পথ প্রচার করেছেন, কবুল করার আহবান জানিয়েছেন, এটা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র নিকট হতে, অপূর্ব নিয়ামত ও সম্মান লাভের অধিকারী প্রমাণিত হয়েছেন। এই নিয়ামত এই দুনিয়ার জীবনেও তারা পেয়েছেন, আর আখেরাতেও তা তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্‌র নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের চলার পথ ও অনুসৃত জীবনই হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য একমাত্র পথ ও পন্থা। এতদ্ব্যতীত মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, অনুসরণীয় ও কল্যাণকর পথ আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা এবং তাদের পথ বাস্তবিক পক্ষে কি? এর উত্তর অন্য আয়াতে এসেছে, “যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত। এবং তখন আমি আমার কাছ থেকে ‘তাদেরকে নিশ্চয় মহাপুরস্কার প্রদান করতাম এবং তাদেরকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করতাম। আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ (যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন) তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! এগুলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট " [সূরা আন-নিসাঃ ৬৬-৭০] এ আয়াত থেকে সঠিক ও দৃঢ় জীবন পথ যে কোনটি আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকগণ যে কোন পথে চলেছেন ও চলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবার অধিকারী হয়েছেন তা সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানা যায়। তারা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীন। [ইবন কাসীর]

এটা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ‘সিরাতুল মুস্তাকীম' এর দ্বিতীয় পরিচয়। আল্লাহ্ তা'আলা যে পথ মানুষের সম্মুখে চিরন্তন কল্যাণ লাভের জন্য উপস্থাপিত করেছেন সে পথ অভিশাপের পথ নয় এবং সে পথে যারা চলে তাদের উপর কখনই আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হতে পারে না। সে পথ তো রহমতের পথ বরং সে পথের পথিকদের প্রতি দুনিয়াতে যেমন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সাহায্য বর্ষিত হয়ে থাকে, আখেরাতেও তারা আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী সন্তোষ লাভের অধিকারী হবে। এই আয়াতাংশের অপর একটি অনুবাদ হচ্ছে, “তাদের পথ নয় যাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নাযিল হয়েছে। " এরূপ অনুবাদ করলে তাতে ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ ছাড়া আরও একটি পথের ইঙ্গিত মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়, যা আল্লাহ্‌র নিকট হতে অভিশপ্ত এবং সেই পথ হতে মানুষকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য মনে হয়। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ মূলতঃ একটি

পথই উপস্থাপিত করেছেন এবং একটি পথেরই ইতিবাচক দুইটি বিশেষণ দ্বারা সেটাকে অত্যধিক সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। তাই অনেকেই পূর্বোক্ত প্রথম অনুবাদটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। উভয় অর্থের জন্য [দেখুন, যামাখশারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

প্রথম অনুবাদ বা দ্বিতীয় অনুবাদ যাই হোক না কেন এখানে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে প্রকারান্তরে এমন পথ ও পন্থা গ্রহণ হতে বিরত থাকবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যা আল্লাহ্‌র অভিশাপের পথ, যে পথে চলে কোন কোন লোক অভিশপ্ত' হয়েছে।

কিন্তু সে অভিশপ্ত কারা, কারা কোন পথে চলে আল্লাহ্‌র নিকট হতে অভিশপ্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেয়া আবশ্যক। কুরআন মাজীদ ঐতিহাসিক জাতিদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ "আর তাদের উপর অপমান লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কষাঘাত হানা হয়েছে এবং তারা আল্লাহ্‌র অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছে। " [সূরা আল-বাকারাহ: ৬১]

পূর্বাপর আলোচনা করলে নিঃসন্দেহে এটা বুঝতে পারা যায় যে, এ কথাটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই 'মাগদুব' বলতে যে এখানে ইয়াহুদীদের বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে সমস্ত মুফাসসিরই একমত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসেও অনুরূপ স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩২,৩৩]

এটি 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর তৃতীয় ও সর্বশেষ পরিচয়। অর্থাৎ যারা সিরাতুল মুস্তাকীম এ চলে আল্লাহ্‌র নিয়ামত লাভ করতে পেরেছেন তারা পথভ্রষ্ট নন-কোন গোমরাহীর পথে তারা চলেন না। পূর্বোল্লেখিত আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেরও অন্য অনুবাদ হচ্ছে, 'তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, যারা গোমরাহ হয়ে আল্লাহ্‌র উপস্থাপিত পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে এ পথ-ভ্রষ্ট লোকদের পরিচয় জানতে পারা যায় যে, দুনিয়ার ইতিহাসে নাসারাগণ হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত এ গোমরাহ ও পথ-ভ্রষ্ট জাতি। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩২,৩৩, ৭৭]

কোন মুসলিম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথাই ঘোষণা করে যে, "হে আল্লাহ্‌ আমরা স্বীকার করি, আপনার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে জীবন-ধারা গড়ে উঠে তা-ই একমাত্র মুক্তির পথ। এজন্য আপনার নির্ধারিত এ পথে চলে যারা আপনার নিয়ামত পেয়েছেন সেই পথই একমাত্র সত্য ও কল্যাণের পথ, আল্লাহ্‌ সেই পথেই আমাদেরকে চলবার তাওফীক দিন। আর যাদের উপর আপনার অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে ও যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের যেন আমরা অনুসরণ না করি। কেননা, সে পথে প্রকৃতই কোন কল্যাণ নেই। " বস্তুতঃ পবিত্র কুরআন দুনিয়ার বর্তমান বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সর্বশেষ আল্লাহ্‌র দেয়া গ্রন্থ। এর উপস্থাপিত আদর্শ ও জীবন পথই হচ্ছে বিশ্বমানবতার একমাত্র স্থায়ী ও কল্যাণের পথ। এর বিপরীত সমস্ত জীবনাদর্শকে মিথ্যা প্রমাণ করে একমাত্র এরই উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদেরকে গঠন করা মুসলিমদের একমাত্র দায়িত্ব। মুসলিমরা আজও সেই দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হলে সূরা আল-ফাতিহা তাদের জীবনে সার্থক হবে।

মূলতঃ যারা সূরা আল-ফাতিহার অর্থ বুঝে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর তাদের মন থেকে দো'আ করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দো'আ কবুল করবেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(إذا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ، فَقُوْلُوْ اٰمِيْنَ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)

"যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বা 'হে আল্লাহ্‌ কবুল কর' একথাটি বল; কেননা যার কথাটি ফেরেশতাদের কথা অনুযায়ী হবে তার পূর্বেরগুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে "[বুখারী ৭৮২,মুসলিম: ৪০৯।

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

(وَاِذا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُوْلُوْ اٰمِيْنَ، يُجِيْبُكمُ اللّٰهُ)

"যখন 'ইমাম গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বা 'হে আল্লাহ্ কবুল কর' একথাটি বল; এতে আল্লাহ্ তোমাদের আহবানে সাড়া দিবেন (দো'আ কবুল করবেন) "[মুসলিম: ৪০৪]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(مَا حَسَدَتْكُمْ اليَهُوْدُ عَلَى شَيئٍ مَا حَسَدَ تْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْن)

"ইয়াহুদীরা তোমাদেরকে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন' বলার চেয়ে বেশী কোন বিষয়ের উপর হিংসা করে না।" [ইবনে মাজাহঃ ৮৫৬]

মহান আল্লাহর কাছ থেকে আমরা যে সোজা পথটির জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে তার পরিচয়। অর্থাৎ এমন পথ যার ওপর সবসময় তোমার প্রিয়জনেরা চলেছেন। সেই নির্ভুল রাজপথটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি ও যে দলটিই তার ওপর চলেছে সে তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং তোমার দানে তার জীবন পাত্র পরিপূর্ণ হয়েছে।

অর্থাৎ 'অনুগ্রহ' লাভকারী হিসাবে আমরা এমন সব লোককে চিহ্নিত করিনি যারা আপাতদৃষ্টিতে সাময়িকভাবে তোমার পার্থিব অনুগ্রহ লাভ করে থাকে ঠিকই কিন্তু আসলে তারা হয় তোমার গযব ও শাস্তির অধিকারী এবং এভাবে তারা নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথ হারিয়ে ফেলে। এ নেতিবাচক ব্যাখ্যায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'অনুগ্রহ' বলতে আমরা যথার্থ ও স্থায়ী অনুগ্রহ বুঝাচ্ছি, যা আসলে সঠিক পথে চলা ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের ফলে অর্জিত হয়। এমন কোন সাময়িক ও লোক দেখানো অনুগ্রহ নয়, যা ইতিপূর্বে ফেরাউন, নমরূদ ও কারুনরা লাভ করেছিল এবং আজও আমাদের চোখের সামনে বড় বড় যালেম, দুস্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা যেগুলো লাভ করে চলেছে।

আমীন বলার ফযীলত ও তাৎপর্য:

(آمِيْن) আমীন অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি কবূল কর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতেন, তখন আমীন বলতেন। যদি তাঁর কিরাআত আওয়াজের সাথে হতো তাহলে আমীনও সেরূপ আওয়াজের সাথে হতো এবং পেছনে যারা থাকতেন তারাও আমীন বলতেন।

সাহাবী ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه و سلم قَرَأَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنْ) فَقَالَ آمِيْن وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে "গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায-যল্লীন" পড়ার পর সরবে আমীন বলতে শুনেছি। (তিরমিযী হা: ২৪৮, মিশকাত হা: ৮৪৫, সহীহ)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ইমাম যখন আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৭৮০, সহীহ মুসলিম হা: ৯৪২)

সাহাবী ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- إِذَا قَرَأَ (وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ آمِين وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন "ওয়ালায-যল্লীন"বলতেন তখন আমীন বলতেন। তিনি আমীনের আওয়াজটা জোরে করতেন। (আবূ দাউদ হা: ৯৩২, সহীহ) ইমাম বুখারী বলেন:

بَاب جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ وَقَالَ عَطَاءٌ آمِينَ دُعَاءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّي إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً....

"অনুচ্ছেদ: ইমামের উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা সম্পর্কে, তাবেয়ী আত্বা (রহঃ) বলেন: আমীন হল দু'আ। সাহাবী ইবনু যুবাইর (রাঃ) ও তাঁর পেছনের মুক্তাদীরা এমন জোরে আমীন বলতেন যাতে মসজিদ আওয়াজে গমগম করে উঠত...।" (সহীহ বুখারী ১/১০৭, কিতাবুল আযান, অনুচ্ছেদ: ইমামের উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা সম্পর্কে) তখন থেকে আজও পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ঘর কা'বা এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাসজিদ আমীনের আওয়াজে গমগম করছে। আমীন সরবে বলার স্বপক্ষে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে

رَفَعَ ، مَدَّ ، جَهَرَ ، اِرْتَجَّ

এ চারটি শব্দ বর্ণিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সরব কিরাআতে আমীন কখনও নিরবে ছিল না। (আবূ দাউদ হা: ৯৩২, ৯৩৪, তিরমিযী হা: ২৪৮, সহীহ) এটাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত।

আয়িশাহ (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের সালাম করা ও সালাতে উঁচু আওয়াজে আমীন বলাতে ইয়াহূদীদের যত হিংসা হয় আর কোন জিনিসে ওদের এত হিংসা হয় না। অতএব তোমরা খুব বেশি বেশি করে আমীন বলো। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা: ১৫৮৫, ইবনু মাযাহ হা: ৮৫৬) তাই ইয়াহূদীদের পথে না গিয়ে সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা কর্তব্য। আমীন বলার ফযীলত যে কত বড় তা গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। কিন্তু নিয়ম হলো ইমামের আমীন শুনে মুক্তাদীরা আমীন বলবে, ইমামের আগে নয় এবং পৃথকভাবে পরেও নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সূরা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

১. 'বিসমিল্লাহ...'সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত। তবে সালাতে তা নিরবে পড়তে হবে।
২. সূরা ফাতিহার একাধিক নাম ও ফযীলত অবগত হলাম।
৩. সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অপরিহার্য, কারণ সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন ব্যক্তির কোন সালাত হবে না।
৪. তাওহীদ এর সঠিক পরিচয় এবং তাওহীদ তিন প্রকার- এ সম্পর্কে অবগত হলাম।
৫. সূরা ফাতিহায় আমরা দু'আর পদ্ধতি অবগত হই, প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে হবে তারপর তাঁর কাছে চাইতে হবে।
৫. আল্লাহ তা'আলা প্রতিফল দিবসের মালিক, তিনি মানুষের পার্থিব জীবনের প্রতিটি ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিফল দেবেন। সেজন্য প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করাবেন।
৬. সিজদা, সালাত, সিয়াম ও দু'আসহ সকল প্রকার ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার আল্লাহ তা'আলা এবং সকল প্রকার আবেদন ও নিবেদন একমাত্র তাঁরই কাছে হতে হবে।
৭. জানা ও মানা দু'টিই আবশ্যক। জানার পর না মানলে যেমন নিন্দনীয় ও অমার্জনীয় তেমনি না জেনে আমল করাও নিন্দনীয়।
৮. এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ এর বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচিত হয়েছে।
৯. সরবে কিরাআতবিশিষ্ট সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম মুক্তাদি সকলের সরবে আমীন বলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের সুন্নাত।